বিদ্যাসাগরের মাতা
ভগবতী দেবী
সতীকুমার নাগ

সতীকুমার নাগ

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। কলিকাতা ১২

Vidyasagarer Mata
Bhagabati Devi
SATIKUMAR NAG
Price: Rupees five only

জানুয়ারী : ১৯৭৮
বিশেষ সচিত্র সংস্করণ ঃ পাঁচ টাকা

চিত্রশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক
শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
সি ২৯-৩১ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-৭০০০০৭

মুদ্রাকর
দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-৫৪

'সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনগঠনে একশ' শিক্ষকের প্রভাব অপেক্ষা সদ্-মাতার প্রভাবই অধিক।'

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণহরণবাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন-মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে।

—রবীন্দ্রনাথ

লেখকের কথা

এই পৃথিবীতে যাঁরা স্মরণীয় বরণীয়, তাঁদের জীবনচরিতের পটভূমিকায় রয়েছে মায়ের অবদান।

প্রথম প্রভাতের জীবনবেলায় তাঁদের মায়ের স্নেহ-স্পর্শে তাঁদের শিশু-জীবনের বিকাশ ঘটে। মায়ের শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্মে-কর্মে, মায়ের সদ্‌গুণাবলীর প্রভাবে শিশুর ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ে ওঠে। জননীর প্রভাব, আধিপত্য লাভ করেই নেপোলিয়ন হলেন শ্রেষ্ঠ বীর। জর্জ ওয়াশিংটন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অধিনায়ক। আব্রাহাম লিংকন হলেন নিগ্রোজাতির দাসত্ব-শৃংখলের মুক্তিদাতা। এ সব প্রণম্য মহান ব্যক্তি তাঁদের মহীয়সী জননীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন প্রথম প্রেরণা। জননীর প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁরা। তাই তাঁদের কর্মজীবন যশোগৌরবে গাঁথা। আমরা তাঁদের গলায় পরিয়ে দিই ফুলের মালা আর মাথায় পরিয়ে দিই যশের মুকুট। তাঁদের মহিমাগীতি গেয়েছেন বিশ্বের কবি, শিল্পী, গায়ক, যুগ-যুগান্ত ধরে। তাঁদের কীর্তি অবিনশ্বর, অক্ষয়!

এই কীর্তি, এই যশ,—এর পিছনে রয়েছে জননীর শুভেচ্ছা আর জননীর অবদান ঃ জননীর প্রভাবেই এই বিশ্বে তাঁরা হয়েছেন মহান পুরুষ।

আমাদের এই বাংলা দেশ ফলে-ফুলে বিচিত্র সৌন্দর্যে ভরপুর। এই বাংলার এক নিভৃত পল্লী ঃ সেই নির্জন, নিরালা পল্লীর এক কুটিরে পুণ্যবতী ভগবতী দেবী বাস করতেন। এই আদর্শবতী প্রাতঃস্মরণীয়া ভগবতী দেবীই ছিলেন মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতা। মায়ের আদর্শে গড়া ঈশ্বরচন্দ্র। মায়ের প্রভাবে ঈশ্বরচন্দ্র হয়েছেন বড়, মহৎ। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে ঃ Mother is worth a one hundred school masters.এ কথাটি ভগবতী দেবী সম্পর্কে অনায়াসে বলতে পারি।

পুণ্যবতী ভগবতী দেবীর জীবনের অসংখ্য কাহিনী মণি-মুক্তার মত চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। সে সব কাহিনী কুড়িয়ে এনে এক সুতোতে মালা গেঁথেছি।
এই প্রসঙ্গে ভগবতী দেবী সম্পর্কে স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু অভিমত, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এবং বিদ্যাসাগরের দুই বিশিষ্ট জীবনচরিতে বর্ণিত ভগবতী দেবীর কথাও উদ্ধৃত করে দেওয়া হল।

ভগবতী দেবী স্মরণে

ঈশ্বরচন্দ্র। "মা, আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের পুজো-পার্বণে যে টাকা খরচ হয়, সে টাকা বাঁচিয়ে আমরা এই অন্নসত্রের কাজে খরচ করতে পারি। তুমি যদি বল, তবে এ বছর জগদ্ধাত্রী পুজো বন্ধ করে ঐ ছয় সাতশ টাকা গরীব দুঃখীদের কাজে লাগাতে পারি।"

মাতা ভগবতী দেবী। "ঈশ্বর, তুই ঠিক কথাই বলেছিস। এত ঘটা করে পুজোতে খরচ করা মিছে। এ টাকা দিয়ে ওদের খাওয়াতে পারলে ওদের বাঁচানো যায়। ওরা খেয়ে বাঁচলেই ঠাকুর খুশি হবেন। নারায়ণ ত ওরাই।"

"যাঁদের দুঃখ কষ্টে আমরা লালিত পালিত, যাঁদের স্নেহ মমতায় আমরা সুরক্ষিত, সেই পিতা মাতাই পরম দেবতা স্থানীয়। তাঁদের ছেড়ে অন্য দেবতার পুজোয় ধর্ম হয় না।...আমি তোমাদের কাশী বা বিশ্বেশ্বর মানি না।...আমার বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা আমার পিতৃদেব ও জননী দেবী।...
আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ মাত্রও পেতাম, তা হলে কৃতার্থ হতাম।...
আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলে মনে করি।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

"ভগবতী দেবীর এই পবিত্র মুখশ্রীর গভীরতা এবং উদারতা বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়াও শেষ করিতে পারা যায় না। উন্নত-ললাটে তাঁহার বুদ্ধির প্রসার, সুদূরদর্শী স্নেহবর্ষী আয়ত নেত্র, সরল সুগঠিত নাসিকা, দয়াপূর্ণ ওষ্ঠাধর, দৃঢ়তাপূর্ণ চিবুক, এবং সমস্ত মুখের একটি মহিমময় সুসংযত সৌন্দর্য দর্শকের হৃদয়কে বহুদূরে এবং বহুঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়......

ভগবতী দেবীর অকুণ্ঠিত দয়া তাঁহার গ্রাম, পল্লী, প্রতিবেশীকে নিয়ত অভিষিক্ত করিয়া রাখিত। রোগার্তের সেবা, ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং শোকাতুরের দুঃখে শোক প্রকাশ করা তাঁহার নিত্যনিয়মিত কার্য ছিল।

দয়াবৃত্তি আরো অনেক রমণীর মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু ভগবতী দেবীর দয়ার মধ্যে একটি অসাধারণত্ব ছিল, তাহা কোনো প্রকার সংকীর্ণ সংস্কারের দ্বারা বদ্ধ ছিল না। সাধারণ লোকের দয়া দিয়াশেলাই-শলাকার মতো কেবল বিশেষরূপ সংঘর্ষেই জ্বলিয়া উঠে এবং তাহা অভ্যাস ও লোকাচারের ক্ষুদ্র বাক্সের মধ্যেই বদ্ধ। কিন্তু ভগবতী দেবীর হৃদয়, সূর্যের ন্যায় আপনার বুদ্ধি-উজ্জ্বল দয়ারশ্মি স্বভাবতই চতুর্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিত। শাস্ত্রের বা প্রথা-সংঘর্ষের অপেক্ষা করিত না।

...জননীর চরিতে এবং পুত্রের চরিতে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাঁহারা যেন পরস্পরের পুনরাবৃত্তি। তাহা ছাড়া, মহাপুরুষের ইতিহাস বাহিরের নানা কার্যে এবং জীবনবৃত্তান্তে স্থায়ী হয়, আর মহৎ নারীর ইতিহাস তাঁহার পুত্রের চরিত্রে তাঁহার স্বামীর কার্যে রচিত হইতে থাকে, এবং সে লেখায় তাঁহার নামোল্লেখ থাকে না। অতএব, বিদ্যাসাগরের জীবনে তাঁহার মাতার জীবনচরিত্র কেমন করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহা ভালরূপে আলোচনা না করিলে উভয়েরই জীবনী অসম্পূর্ণ থাকে।"

বিদ্যাসাগর চরিত: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যোগ্য পুত্র যোগ্য মাতা

"কেহ কি পুঙখানুপুঙখরূপে অনুসন্ধান করিয়াছেন কোন্ উপাদানে মহামনা মহাপুরুষ বিদ্যাসাগরের মহচ্চরিত্র গঠিত হইয়াছিল? বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল লোক দেখিতে পাইবেন যে, বিদ্যাসাগররূপ পুত্তলিকার প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ে তাঁহার চিরপূজনীয় পিতৃদেব দৃঢ়চিত্ত ও উদারহৃদয় ঠাকুরদাসের—বিশেষভাবে তদীয় চিরপূজনীয়া জননী—সেই পুণ্যবতী সহৃদয়া বঙ্গললনা ভগবতী দেবীর কোমল হস্ত দুখানি নিরন্তর পশ্চাৎ হইতে খাটিয়াছে। সেই দয়াবতী সাধ্বীর কোমল হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু ক্ষরণে বিদ্যাসাগররূপ মহা-সাগরের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই হিন্দুবধূ পরম যত্নে ঈশ্বরচন্দ্রকে লালন পালন করিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী জাতির মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন।"

বিদ্যাসাগর : চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দয়াময়ী জননী

"ভগবতী দেবী এক বিচিত্র উপাদানে গঠিত হইয়াছিলেন। পরিশ্রমে কখনও কাতর হইতেন না। দিনে হউক রাত্রিতে হউক, পরিশ্রমের পরিমাণ অল্পই হউক, বা অধিক হউক, গৃহে পরিবার-বর্গের সেবাতে হউক বা অতিথি-অভ্যাগতের পরিচর্যাতে হউক, কখনও বিমুখ ছিলেন না। দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলকে আহার করাইয়াও নিজে সহজে আহার করিতেন না, ঐরূপ অনশনে অপেক্ষা করিবার তাৎপর্য এই যে, যদি কোনো উপবাসী অতিথি কিংবা কোনো দরিদ্র লোক এক মুষ্টি ভাতের জন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আহারে বসিতেছেন, এমন সময়ে কোনো ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলে, তৎক্ষণাৎ সেই অন্নব্যঞ্জনে তাহার সেবা করিয়া, হয় নিজে উপবাসে কাটাইতেন, না হয় বধূদের কেহ পুনরায়

তাঁহার আহার্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, তবে অপরাহ্ণে আহার করিতেন। বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে নিজের গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতেন, বাজারের ফেরত লোক স্নানাহার না করিয়া কেহ দ্বার অতিক্রম করে কিনা। এরূপ লোককে যাইতে দেখিলে, ডাকিতেন, স্নান করিতে বলিতেন, স্নান করিলে পর এক মুঠা ভাত খাইয়া, না হয় চারিটি জলপান লইয়া যাইতে বলিতেন। এরূপ পরদুঃখকাতরা ও পর-সেবাপরায়ণা রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে বিরাজ করিতেছেন, সে গৃহের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কী? সত্য সত্যই এই সুগৃহিণীর জীবদ্দশায় ঠাকুরদাসের সুবৃহৎ পরিবার ভগবানের প্রসন্ন দৃষ্টিলাভে পরম সুখে কাল কাটাইয়াছেন।
তিনি যে কেবল পতি পুত্রকন্যা পৌত্রপৌত্রী প্রভৃতি পরিজনবর্গের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিংবা তিনি যে কেবল গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিয়া দুঃখীজনের দুঃখ হরণ করিতে প্রয়াস পাইতেন তাহা নহে, পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য তাঁহার পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান রোগ ছিল। সকল ঘরের সংবাদ লইতে ও সকলের অভাব মোচন করিতে সর্বদাই উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহার এই ধাতটুকু ঈশ্বরচন্দ্র ষোল আনাই পাইয়াছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে জননীর কথা উপস্থিত করিলেই মাতৃভক্ত সন্তান বলিতেনঃ 'আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ-মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।'

ভগবতী দেবী বড় সরলহৃদয়া রমণী ছিলেন। লোকের দুঃখকষ্টের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। বিশেষত বিপন্ন ব্যক্তি যদি দরিদ্র হইল, যদি কোনো প্রকারে শুনিতে পাইতেন যে, কোনো অসহায় পুরুষ বা স্ত্রীলোক সাহায্যাভাবে ক্লেশ পাইতেছে, তাঁহার হৃদয় অমনি ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তিনি নিরন্তর পরসেবাতেই সময়াতিপাত করিতেন। বীরসিংহ গ্রামের অনেক লোক এখনও সাক্ষ্য দিতেছে যে, তিনি দিবারাত্র জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হাড়ি ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়িতে পীড়িত লোকদের পথ্যের ব্যবস্থা করিতে, তাহাদিগকে ঔষধ খাওয়াইতে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন; অনেক সময়ে তাঁহাকে সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যাইত যে, তিনি কোনো অস্পৃশ্য জাতির দ্বারে বসিয়া সে বাড়ির রোগীর পথ্যের বা

ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক সময়ে সাগু ও মিছরি সঙ্গে থাকিত, যাহাদের রাঁধিবার লোক না থাকিত, নিজে বাড়ি আসিয়া তাহাদের জন্য পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। এইরূপে অতিথি-অভ্যাগত ও দরিদ্রের সেবা করিতেই তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত।"

বিদ্যাসাগর ঃ চন্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণাময়ী জননী

"সন ১২৭৫ সালের চৈত্রমাসে এক দুর্ঘটনা হয়। বীরসিংহস্থ পৈতৃক বসতবাটীর সমস্ত গৃহ নিশীথসময়ে অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হয়। মধ্যমাগ্রজ [দীনবন্ধু, বিদ্যাসাগরের অনুজ] ও জননী দেবী [বিদ্যাসাগর-জননী ভগবতী দেবী] প্রভৃতি নিদ্রিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সকলেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দ্রব্যাদি কিছুমাত্র বাহির করিতে পারা যায় নাই। অগ্রজ [বিদ্যাসাগর], এই সংবাদ পাইবামাত্র দেশে আগমন করেন। জননী দেবীকে সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য যত্ন পাইলেন; কিন্তু তিনি বলিলেন, "আমি কলিকাতা যাইব না। কারণ, যে সকল দরিদ্র লোকের সন্তানগণ এখানে ভোজন করিয়া বীরসিংহ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, আমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর প্রস্থান করিলে, তাহারা কী খাইয়া স্কুলে অধ্যয়ন করিবে? কে দরিদ্র বালকগণকে স্নেহ করিবে? বেলা দুই প্রহরের সময় যে সকল বিদেশস্থ লোক ভোজন করিবার মানসে এখানে সমাগত হন, কে তাঁহাদিগকে আদর অভ্যর্থনাপূর্বক ভোজন করাইবে? যে সকল কুটুম্ব আগমন করিবেন, কে তাঁহাদিগকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইবে?" জননী দেবী কলিকাতা যাইতে সম্মত হইলেন না; তজ্জন্য তাঁহার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করেন।...জননী দেবী, সর্বদা গ্রামস্থ অভুক্ত লোককে ভোজন করাইতেন। স্থানীয় প্রতিবাসিগণ পীড়িত হইলে, সর্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ঐ বাস্তুভিটা দেখিয়া রোদন করিতেন। জননী দেবীর দান-খয়রাতের জন্য যখন যাহা আবশ্যক হইত, অগ্রজ মহাশয় [বিদ্যাসাগর] অবিলম্বে

তাহা পাঠাইতেন। তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, অগ্রজ মহাশয় সেই কার্য অবিলম্বে সম্পন্ন করিতেন। প্রতি বৎসরেই অগ্রজকে অনুরোধ করিয়া, বীরসিংহ বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রের ও অন্যান্য অনেক দীন-দরিদ্রের কর্ম করিয়া দিতেন। বৎসরের মধ্যে নূতন নূতন অনেক কুটুম্ব ও গ্রামস্থ অনাথগণের মাসহারা করাইয়া দিতেন। জননী দেবীর ও পিতৃদেবের স্বর্ণালংকারের প্রতি বিলক্ষণ দ্বেষ ছিল; জননী দেবী, বাটীর স্ত্রীলোকদের জন্য মোটা বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেন, এবং পাকাদি সাংসারিক কার্য করিবার জন্য সর্বদা উপদেশ দিতেন। তিনি বিদেশীয় অনুপায় রোগীদের শুশ্রূষাদি কার্যে বিশেষরূপ যত্নবতী ছিলেন। কাহারও নিরামিষ ব্যঞ্জন, কাহারও মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি স্বয়ং প্রস্তুত করিয়া দিতেন। তাঁহাকে এই কার্যে কখনও বিরক্ত হইতে দেখা যায় নাই। বিবাহিতা বিধবাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইয়া চিকিৎসার জন্য বাটীতে আসিলে, অথবা অপর কেহ রোগগ্রস্ত হইয়া উপস্থিত হইলে, জননী দেবী তাহাদের মলমূত্রাদি পরিষ্কার করিতেন; তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করিতেন না। এ প্রদেশের অনেকেই প্রায় বলিয়া থাকেন যে, অগ্রজ মহাশয় বাল্যকাল হইতে জননী দেবীর দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল অধিকার করিয়াছেন। জননী দেবী, পরের দুঃখাবলোকনে রোদন করিতেন। অগ্রজও সাধারণ লোকের শোকতাপ দেখিয়া রোদন করিতেন। দয়াময়ী জননী দেবী, গ্রামস্থ অনেককেই টাকা ধার দিতেন; কিন্তু কাহারও নিকট পাইবার আশা রাখিতেন না।”

বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ঃ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন

সূচীপত্র

মাতার প্রভাব পুত্রের উপর

'মা—'

'কে? ঈশ্বর...আয়...! এ কি তোর পরনে ছেঁড়া কাপড় দেখছি! তোর নিজের কাপড়খানা—'

মার কথা শেষ হবার আগেই ঈশ্বর বলেন, 'মা, আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়ে। ছেলেটি বড় গরীব। ওর পরনে ছেঁড়া কাপড়খানা ছিল। আমি ওকে বললাম, তোর কাপড়খানা আমাকে দে; আর তুই আমার এ কাপড়খানা পর। মা, আমি জানি, তুমি একাজে আমাকে কখনো বকবে না।—'

মা ঈশ্বরকে বুকের কাছে টেনে নেন। স্নেহের সঙ্গে মা বলেন—'বেশ করেছিস, ঈশ্বর! ভাল কাজে কেউ কাকে বকে নাকি? পরের দুঃখ দেখে যার মন কাঁদে, তাকে ভগবান ভালবাসেন। দেখিস, ভগবান তোর ভাল করবেন।—'

'পরের দুঃখ দূর করতে হয়'—এই শিক্ষাই ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম মায়ের কাছ থেকে লাভ করেন। মায়ের এই শিক্ষা পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র হতে পেরেছিলেন 'বিদ্যাসাগর' আর 'দয়ার সাগর'।

ভগবতী দেবী কোন সন্তানকে ভাল কাজ করতে দেখলেই তাকে আদর করেন; তাকে তার কাজে উৎসাহ দেন। এমন কি, তার সৎ-কাজের জন্য তাকে তিনি পুরস্কারও দেন। সন্তানের ভাল কাজে ভগবতী দেবীর আনন্দের আর সীমা ছিল না। মায়ের এই আনন্দ দেখে ছেলেরাও আনন্দিত হত।

তিনি সব সময়ই চাইতেন যে, এই সংসারে যে সব সদ্‌গুণ আছে, সে সব গুণ তাঁর সন্তানদের মধ্যে ফুটে উঠুক। এ কথা তাঁর ভাল জানা ছিল : মায়ের স্নেহ, ভালবাসা, মায়া ও মমতার গুণেই সদ্‌গুণ-

গুলি তাদের মধ্যে বিকাশ লাভ করে। তাই তিনি কোনদিন কঠিন শাসনে তাদের বেঁধে রাখেন নি। সামান্য অপরাধে তাকে সাজা দেন নি। স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা দিয়ে তিনি ছেলেমেয়েদের শাসন করতেন।

অনেক সময় অনেক ছেলে মেয়ে না জেনেও ভুল বা অন্যায় করে। এ অজানা ভুল বা অন্যায় তার স্বেচ্ছাকৃত নয়। সেখানে তাকে তিরস্কার না করে, প্রহার না করে, তার ভুল বা অন্যায়কে বুঝিয়ে দিলেই, সে তখন তার ভুল বুঝতে পারে।—এই শিক্ষাই ছিল ভগবতী দেবীর। তিনি বলতেন: 'যখন সে বুঝতে পারবে তার অন্যায় হয়েছে, সে তখন নিজেই বলবে: 'সত্যি খুব অন্যায় করেছি। আর কখনও এ কাজ করব না'—!'

পাঠশালার ছুটি হয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ী ফিরে চলেছেন। পথের ধারে ধানের ক্ষেত। ঈশ্বরচন্দ্র ধানের শিষ তুলে, মুখে নিয়ে দাঁত দিয়ে চিবুচ্ছেন। এক সময় ধানের শিষের একটি শুঁয়ো তাঁর গলায় বিঁধে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে আসে। ঐ অবস্থায় কয়েকজন সহপাঠী তাঁকে ধরাধরি করে বাড়ীতে নিয়ে আসে। ঠাকুরমা কোন রকমে ধানের শুঁয়ো তাঁর গলা থেকে বের করে আনেন। ভগবানের দয়াতেই ঈশ্বরচন্দ্র সেবার বেঁচে উঠলেন।

কি আশ্চর্য! ভগবতী দেবী কিন্তু ঈশ্বরকে বকলেন না। স্নেহের স্বরে বললেন: 'আর কখনও ধানের শিষ মুখে দিস্ নে! না বলে অপরের কোন জিনিসে হাত দিতে নেই।—'

তা'ছাড়া ভগবতী দেবী যে সব শস্যের শিষে শুঁয়ো আছে, সে সব শস্যের নাম ঈশ্বরকে বললেন। এরপর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র কোন দিন কোন শস্যের শিষ তুলে মুখে দেন নি।

অপর কোন মা হ'লে এ অবস্থায় ছেলেকে কি করতেন?

মা ছেলেকে বকতেন, আর প্রহার করতেন। এর ফলে, ছেলেই বেশী যন্ত্রণা ভোগ করত। এতে অমঙ্গলই ঘটে বেশী। সবার আগে তাকে সেবা শুশ্রূষা করে যন্ত্রণা দূর করাই মায়ের কাজ। ভগবতী দেবীর ঈশ্বরচন্দ্রের প্রাণরক্ষা করার দিকেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। তিনি

জানতেন প্রহার বা তিরস্কার করে, বা ভয় দেখিয়ে কাউকে সুপথে আনা যায় না। স্নেহ ভালবাসা দিয়েই মা অবাধ্য ছেলেকে বশে আনতে পারেন। মায়ের ধৈর্য ও সহনশীলতা থাকা চাই। এ কাজে মায়ের সহনশীলতা হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

এ সংসারে আদর্শবতী মা হওয়া সবচেয়ে কঠিন। যে সব সদ্‌গুণ থাকলে আদর্শবতী মা হওয়া যায়, সে সব গুণের অধিকারিণী ছিলেন ভগবতী দেবী। ভগবতী দেবী আদর্শবতী মা হ'তে পেরেছিলেন বলে ঈশ্বরচন্দ্রও হয়েছিলেন একজন আদর্শ সন্তান।

শৈশবে ঈশ্বরচন্দ্র অশান্ত আর দুষ্টু ছিলেন। তিনি পাড়া-পড়শীদের বাগানে যেতেন। তাদের ফলের গাছ থেকে ফল পেড়ে খেতেন। তাঁর দস্যিপনায় প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ত। এ সব অভিযোগ ভগবতী দেবীর কানে আসত।

একদিন তিনি ঈশ্বরকে কাছে ডেকে বললেন : 'ঈশ্বর, তুই তোর সহপাঠীর ছেঁড়া কাপড়খানা দেখে, তাকে দিয়ে এলি তোর ভাল কাপড়খানা : আর তুই তার ছেঁড়া কাপড়খানা পরে বাড়ীতে এলি। আমি জানি, কারও দুঃখ দেখলে তুই মনে বড় দুঃখ পাস। আর পাড়াপড়শীদের বাগানে গিয়ে, তাদের গাছ থেকে ফল পাড়িস। তোর এ কাজে তারা মনে ভারী কষ্ট পায়। তোর কত দয়া মায়া আছে, তা আমি জানি। তুই কেন তাদের দুঃখ দিস?—'

মায়ের এ কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র কিছু বলতে পারেন না। তিনি বুঝতে পারেন : 'সত্যি আমার একাজে পাড়াপড়শীরা দুঃখ পায়—!'

এরপর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র আর কোন দিন কারও বাগানের ফল পাড়েন নি।

ভগবতী দেবী ছিলেন যেন জাদুকরী। তাঁর স্নেহ, মায়ার পরশে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বভাবের পরিবর্তন আসে।

ছোটবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন ভারী একগুঁয়ে। এ জন্য ঠাকুরদাস ছেলেকে অনেক সময় প্রহার করতেন। একগুঁয়ে স্বভাবের জন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে 'ঘাড় কেঁদো' বলে ডাকতেন।

ভগবতী দেবী ভালভাবেই জানতেন শিশু কি চায়। শিশু চায় ভালবাসা, স্নেহ আর সোহাগ। শিশু এই স্নেহ, ভালবাসারই বশীভূত। স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের শাসন-ই সত্যিকার শাসন।

একদিন ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে আদর ও সোহাগ করে বুঝিয়ে বলেন : 'কত্তা যা তোকে করতে বলেন, তা যদি না করিস, তবে তিনি মনে দুঃখ পান। তিনি তোকে কত ভালবাসেন, কত আদর করেন। তাই তোকে যিনি এত ভালবাসেন, এত সোহাগ করেন, তিনি আবার তোকে শাসনও করতে পারেন।'—

সত্যি, এর পর ঈশ্বরচন্দ্র বদলে গেলেন। ঠাকুরদাস ছেলেকে যে কাজ করতে বলেন, সেকাজ তিনি হাসিমুখে করেন। যে কাজে ঠাকুরদাস ব'কেন, ভয় দেখিয়ে করাতে পারেন নি, সে কাজ ভগবতী দেবী সহজে সমাধা করান স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে।

ভগবতী দেবী ছেলেদের বলতেন : 'নিজে ভাল খাওয়া, নিজে ভাল জামাকাপড় পরার চেয়ে, পরকে ভাল খাইয়ে, পরকে ভাল কাপড় পরিয়ে, বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। যে অপরের কিছু ভাল করতে পারে, সেই এই সংসারে সত্যিকার আনন্দ পেয়ে থাকে।'

তিনি শুধু মুখেই বলতেন তা নয়। এ সব কাজ নিজে করে ছেলেদের দেখিয়ে দিতেন।

অপরের দুঃখ নিজের অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয়। তা নইলে, এ সংসারে কেউ কারও জন্য কিছু করতে পারে না।

ভগবতী দেবী কখনও অন্যের দোষ, ভুলের বিচার করেন নি। ভুল যাতে সংশোধন হ'য়ে গুণে পরিণত হয়, তা-ই তিনি দেখেছেন। কেননা, যে-দোষে সে অপরাধী, তাকে আবার গুণের দ্বারাই মোচন করা যায়।

যার যাতে বিশ্বাস, তিনি কাউকে তাতে বাধা দিতেন না। নিজের প্রতি বিশ্বাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে শক্তি। এই আত্মবিশ্বাসে শিশুদের দু' একটি ভুল ঘটে থাকে। তাই ভগবতী দেবী বলতেন : এই ভুলটাই যে তার একটা বড় শিক্ষা!—

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে গড়ে তুললে গৌরবময় হ'তে পারে, সে-সব রীতি তাঁর জানা ছিল।

অশান্ত, দুষ্ট শিশুকে তিনি কখনও জুজুর ভয় দেখান নি। এমন কি, আকাশের চাঁদ দেখিয়ে শিশুকে ভুলান নি। স্নেহ, ভালবাসা দিয়েই অশান্ত, দুষ্ট শিশুকে বশে আনেন। তিনি জানেন, শিশুর কোমল মনে কখনও আঘাত করতে নেই।

তিনি ছেলেমেয়েদের বলতেন : 'অবস্থা বুঝে চলবে। ভগবানের কাছে যে-টুকু দরকার, সে-টুকু চাইবে। তার বেশী চাইতে নেই! তা নইলে দুঃখকেই বাড়িয়ে দেয়।—'

ছেলেমেয়েরা সৎকাজে যাতে সদিচ্ছায় প্রণোদিত হয়, সেভাবে ভগবতীদেবী তাঁদের প্রেরণা দিয়েছেন। কাউকে ভাল কাজ করতে দেখে তিনি তাকে উৎসাহ দিতেন।

'ভাল কাজ সে-ই করতে পারে, ভাল মন যার।'—একথা প্রায়ই তিনি বলতেন।

এই দয়াবতী, পুণ্য-শ্লোকা নারী ভগবতী দেবীর জীবন-কথা শোনবার কার না আগ্রহ হয়!

মাতুলালয়ের পরিবেশে

গো-ঘাট গ্রাম—হুগলী জেলায়।

ভগবতী দেবীর পৈতৃক-ভিটা এই গো-ঘাটেই ছিল। জাহানাবাদ মহকুমার অধীনে এই গ্রামটি। এখানে বাস করেন রামকান্ত তর্কবাগীশ। তিনি একজন সংস্কৃত শাস্ত্রের পণ্ডিত। অতি সাধারণভাবে তিনি থাকেন। ভোগ, বিলাস বলে তাঁর কিছু ছিল না। রামকান্ত সংস্কৃতে ও ব্যাকরণে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এইজন্য চট্টোপাধ্যায় মশায় তর্কবাগীশ উপাধিতে ভূষিত হ'ন। ভগবতী দেবীর মাতা গঙ্গামণি দেবী। মাতামহ পঞ্চানন বিদ্যা-বাগীশ। তিনিও তখনকার দিনে একজন নাম-করা স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত। তাঁর বাড়ীতে চতুষ্পাঠী ছিল। এই চতুষ্পাঠীতে ছাত্ররা পড়ে। তিনি ছাত্রদের স্মৃতিশাস্ত্র পড়ান। পিতা রামকান্তও এই চতুষ্পাঠীরই ছাত্র। বিদ্যাবাগীশ মশায় রামকান্তের পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হ'ন। তাঁর কন্যা গঙ্গাদেবীর সঙ্গে রামকান্তের বিয়ে দেন। পিতা রামকান্ত শব সাধনা করেন। এই শব সাধনা করতে গিয়ে পিতার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। এই অবস্থায় মাতা গঙ্গাদেবী কি করেন? শেষে মার সঙ্গে ভগবতী দেবীও মামাবাড়ী আসেন। এই মামাবাড়ীতেই ভগবতী দেবীর ছোটবেলা ও শৈশব জীবন কাটে। তিনি বড় মামার কাছেই বেশী আদর পেয়েছেন। বড় মামাই তাঁকে ভাল কাজে সব সময় উৎসাহ দিয়ে এসেছেন।

তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার তেমন সুযোগ সুবিধে ছিল না। অনেকে মনে করতেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সংসারের কাজে তেমন টান থাকে না।

ভগবতী দেবী বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখবার বিশেষ কোন

সুযোগ পান নি। তিনি যা দেখেছেন, যা শিখেছেন, তা মামাবাড়ী থেকেই।

কি ভাবে চললে ভাল দেখায়, কোন কথা বললে সুন্দর বলা হয়, কি ধরনের আচার-ব্যবহারে শোভনতা প্রকাশ পায়, এই সব বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পড়ে তিনি শেখেন নি। ধর্মের প্রতি অনুরাগ, পূজা-ব্রত-পার্বণ, নিয়ম-নিষ্ঠা পালন করা এ সব তিনি মামাবাড়ী থেকে শিখেছেন।

মামাবাড়ীর পরিবেশই ভগবতী দেবীর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। এর পেছনে তাঁর উৎসাহদাতা ও অনুপ্রেরক ছিলেন মামা রাধিকাভূষণ বিদ্যাভূষণ।

রাধিকাভূষণ ধার্মিক মানুষ ছিলেন। পরের বিপদ দেখলেই তিনি এগিয়ে যান। কারো অভাব শুনলে, তিনি সেখানে ছোটেন। যে কোন উপায়ে তিনি তার অভাব দূর করেন।

তিনি ছিলেন কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি। কখনও কোন কাজে তিনি অধৈর্য প্রকাশ করেন নি।

রাধিকাভূষণের আদর্শে ভগবতী দেবীর বাল্যজীবন গড়ে ওঠে।

ভগবতী দেবীর দৈনন্দিন কাজে কোন অলসতা বা জড়তা ছিল না। তিনি সবার আগে ঘুম থেকে ওঠেন। বাড়ীতে রোজ ঠাকুর পুজো হয়। তাই তিনি বাগান থেকে পুজোর ফুল সাজি ভরে তুলে আনেন। তারপর, তিনি ঠাকুরের আসন সাজিয়ে গুছিয়ে রাখেন। এসব কাজ ছিল তাঁর প্রতিদিনকার। বাড়ীর ছোট ছোট কাজগুলিও তিনি নিজের হাতে করেন। সংসারের কাজের মধ্যেই তিনি ডুবে থাকেন। কাজ নেই বলে হাত পা গুটিয়ে তিনি বসে থাকেন নি। ছুটি বলে তাঁর জীবনে কিছু ছিল না। কাজ করাই ছিল তাঁর ধর্ম। ভগবতী দেবীকে বলা যায়—কর্মদেবী।

ছোটবেলা থেকেই তিনি শিখেছিলেন কখনও কাউকে ছোট মনে করতে নেই। 'তুচ্ছ' বলে কোন জিনিসকে অবহেলা করতে নেই। অতি সামান্য ভাঙা মাটির জিনিসও যত্ন করে তুলে রাখতেন। আর তিনি বলতেন : 'কখন কি দরকার পড়ে তা তো বলা যায় না। এ তুচ্ছ জিনিসও একদিন দরকার পড়তে পারে। তাই কোন কিছু ফেলতে নেই।—'

ভগবতী দেবীর দেমাক, অহঙ্কার কিছু ছিল না। কোনদিন কোন কাজে কাউকে অহমিকা দেখান নি। এটাই ছিল তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ। সংযম, শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা ও শিষ্টতাকে তিনি স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। চরিত্রের নম্রতা সবখানেই সমাদর লাভ করে। ভগবতী দেবীর অনেক কিছু অহঙ্কার করবার ছিল। এক-দিনের জন্যও তিনি কথায় বা কাজে তা প্রকাশ করেন নি। এই দীনতার সঙ্গে তাঁর মেশানো ছিল তেজস্বিতা।

পাড়াপড়শীর কারও অভাব দেখলেই ভগবতী দেবী তাকে চাল, ডাল দিতেন্। এই ছিল তাঁর প্রতিদিনকার একটি কাজ।

একদিন মা ভগবতী দেবীকে বললেন : 'তুই যে রোজ পাড়া-পড়শীদের চাল, ডাল বিলিয়ে দিস, তোর মামা জানতে পারলে রাগ করবেন কিন্তু—'

ভগবতী দেবী মামাকে ভাল করে জানতেন। এসব কাজ দেখলে মামা বরং খুশী হয়েই থাকেন। একটু অভিমান করেই ভগবতী দেবী মাকে উত্তর দেন : 'মা, আমি জানি, মামা আমার একাজে বকবেন না। আর যদি রাগই করেন, তবে তাঁকে বলে কয়ে একটা চরকা নেব। সেই চরকায় সুতো কাটব। সেই সুতো বেচে যে পয়সা পাব, তা দিয়ে আমি চাল, ডাল কিনে ওদের দিয়ে আসব।' এ কথার ভিতর দিয়ে ভগবতী দেবীর তেজস্বী ভাব ফুটে ওঠে।

তাঁর এ নিজের দানের কাজে কারও কাছে তিনি দীনহীন প্রার্থী নন। কারও কাছে এজন্য তিনি অনুগ্রহও চান নি। তাঁর নিজের যেটুকু শক্তি, যোগ্যতা আছে, তা দিয়েই তিনি গরীব, দুঃখীর অভাব দূর করতে চেয়েছেন।

একদিন কিন্তু বড় মামার কানে ঐ কথাগুলি গিয়ে পৌঁছে। বড় মামা ভাগিনেয়ীর এ মহৎ দানের কথা শুনে ভারী খুশী হলেন। তখন ভগবতী দেবী খুব ছোট ছিলেন। অথচ ঐ বয়সে তাঁর কত বুদ্ধি-শুদ্ধি না হয়েছে। বড় মামা ভগবতী দেবীকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন : 'মা যেন আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! তোর ইচ্ছামত গরীবদের দান করিস। জানিস, ওদের দিলে ভাণ্ডার কখনও খালি হয় না। গরীব দুঃখীকে দিলে ভগবান তার বদলে তাকে অনেক বেশী দেন।—'

মামা রাধিকাভূষণ এমনি করে ভগবতী দেবীকে উৎসাহ দিতেন। এ ধরনের উৎসাহ পেয়েই ভগবতী দেবী হয়েছিলেন 'অন্নপূর্ণা'।

মামাবাড়ীর গ্রামে সব শ্রেণীর লোকের বসবাস—বাগ্‌দী, জেলে, মজুর, ধোপা প্রভৃতি। তারা খুবই গরীব। গরীব বলে, ছোট জাত বলে ভগবতী দেবী তাদের দেখেন নি। গরীবের অভাব, গরীবের অভিযোগ কোথায় তা তিনি জানতেন। তাঁর যতটা ক্ষমতা, তা দিয়েই তিনি গরীব দুঃখীদের দুঃখ দূর করেছেন।

তাদের বাড়ীর সমবয়সী মেয়েরা ছিল ভগবতী দেবীর খেলার সঙ্গী। তিনি বাড়ী-বাড়ী গিয়ে তাদের ডেকে বলতেন : 'তোরা আমাদের বাড়ী আসিস। সবাই মিলে খেলবো।—'

তারা আসে তাঁর বাড়ীতে। তারা হৈ চৈ, ছুটোছুটি করে না। তারা গোল হয়ে বসে। ভগবতী দেবী তাদের মাঝখানে বসেন। তারপর তিনি শুরু করেন গল্প।

কোনদিন বা পুরাণের গল্প বলেন, আবার গল্পচ্ছলে নীতি-মূলক বিষয়ও তাদের বলেন। শুধু কি আসরে গল্প বলাই হত? তারপর, শুরু হ'ত তাদের অভাব, অভিযোগের পালা। ভগবতী দেবী তাদের অভাবের কথা মন দিয়ে শুনতেন। কাউকে দিতেন চাল, ডাল আবার কাউকে পরবার শাড়ী দিতেন। তাদের দুঃখে তাঁর চোখে জল আসত। সত্যি, তাদের দুঃখে তিনি ছিলেন সমব্যথী। পরের দুঃখকে তিনি আপন দুঃখ মনে করেন। তাদের দুঃখ দূর করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন। মানুষের উপকার করেই তিনি বেশী আনন্দ পান। এমনি করে তিনি সবাইকে ভালবেসে কাছে টেনে, আপন করে নিয়েছেন। এত দরদ দিয়ে কে কাকে এত-খানি ভালবাসতে পারে? তাই তাঁর 'ভগবতী' নাম সার্থক : এ নামটি উচ্চারণ করতে গিয়ে সহজেই ভক্তি, শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে আসে। ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা হলেও, তিনি ছিলেন 'সবার মা'!

শ্বশুরালয়ের পরিবেশে

ভগবতী দেবী সবে নয় বছরে পা দিয়েছেন। এই সময়েই তাঁর বিয়ে হয়।

হুগলী জেলার মধ্যে বনমালিপুর গ্রাম। এই গ্রামে বাস করেন রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রামে তাঁর বেশ নামডাক। তিনি ছিলেন সাহসী পুরুষ। গাঁয়ের সবাই তাঁকে মানে। তিনি দুঃখ করে বলেন : 'গাঁয়ে কি মানুষ আছে? সব ভেড়ার দল!'—

একবার সুন্দর বন দিয়ে যাচ্ছিলেন। হাতে তাঁর না ছিল লাঠি, না ছিল হাতিয়ার। হঠাৎ তিনি বাঘের মুখে পড়েন। আর কি? বাঘের সঙ্গে তাঁর লড়াই শুরু হ'ল; শেষ পর্যন্ত, বাঘই কাবু হ'ল তাঁর কাছে। এমনি ছিল তাঁর সাহস ও শক্তি।

রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ছেলে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঠাকুরদাসের সঙ্গেই ভগবতী দেবীর বিয়ে হয়। তখন ঠাকুর-দাসের বয়স ছিল তেইশ বছর।

ভগবতী দেবীর শ্বশুরমশায় রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বিয়ে করেছিলেন পণ্ডিত উমাপতি তর্কসিদ্ধান্তের মেয়েকে। রামজয়ের শ্বশুরের বাড়ী ছিল মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। এই বীরসিংহ গ্রামেই রামজয় মশায় আসেন। পরে এখানে তাঁদের বসতবাটি গড়ে ওঠে। সেই থেকে অনেকে বলেন, বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ী।

ঠাকুরদাসের সংসারের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। কাজে কাজেই ঠাকুরদাস কলিকাতায় এলেন কাজের খোঁজে। কলিকাতায় তিনি থাকতেন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে। অনেক চেষ্টার পর তিনি একটা কাজ পান। এই কাজের বেতন ছিল মাসিক দু'টাকা। এই

কাজ পেয়ে ঠাকুরদাসের আনন্দের সীমা ছিল না। কিছুদিন পর, তাঁর বেতন বেড়ে তিন টাকা হয়। এতে সংসারের অনেকটা অভাব, অনটন দূর হয়। এর পরে তিনি তিন টাকা বেশীতে আরেক নতুন জায়গায় কাজ পান। বাড়ীতে নতুন কাজের খবর ও মাইনের কথা শুনে সবাই খুশী হলেন। মা দুর্গাদেবীর আনন্দের সীমা রইল না। এই উপলক্ষ্যে তিনি পাড়াপড়শীদের নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে খাওয়ালেন। তাঁরাও খেয়ে দেয়ে ভারী খুশী হলেন।

শৈশবে ভগবতী দেবী মামাবাড়ীতে স্বচ্ছন্দ অবস্থায় কাটিয়ে এসেছেন। স্বামীর বাড়ীতে এসে তিনি অভাব, অনটনের মধ্যে পড়েন। তা বলে তিনি এতটুকুও অসুখী ছিলেন না। মামা বাড়ীর সুখ-স্বচ্ছন্দতার চেয়ে স্বামীর সংসারে যা জোটে তাই তাঁর কাছে ছিল বড়। স্বামিগৃহে অভাব অনটনে থাকলেও, তিনি সুখে দিন কাটিয়েছেন।

প্রতিদিন তিনি ভোরে ওঠেন। ভোরের কাজগুলি নিজের হাতে করেন। ঘর-দোর পরিষ্কার করেন। উঠোন ঝাঁট দেন। গোবরজল ছড়িয়ে দেন বাড়ীর চারপাশে। খাবার বাসনপত্র ধোন, রান্নাবান্না কি হবে, না হবে, তাও ঠিকঠাক করেন। ভাঁড়ার ঘরে কি আছে, না আছে, তা দেখেন। সব জিনিস সাবধানে রাখেন। মুখ ফুটে কাউকে কোন দুঃখের কথা বলা, তাও বলেন না। শ্বশুর বা শাশুড়ির সামনে কখনো বসেন না। তাঁদের সামনে উঁচু গলায় কথা বলেন না। দেবর, ননদের প্রতি তাঁর মায়া মমতা অসীম। তাছাড়া, বাড়ীর আর পাঁচজন যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও তিনি ভাল ব্যবহার করেন। তাঁর চাল-চলনে কথা-বার্তায় আচার-ব্যবহারে সবাইকে জয় করেছিলেন।

সাংসারিক সব গুণে ভগবতী দেবী গুণবতী। সংসারে 'পতিই পরম গুরু' একথাই তিনি জানতেন। তাঁর সাংসারিক জীবনের এটাই ছিল বড় আদর্শ।

ভগবতী দেবীর তখন বয়স খুব কম ছিল। নয় বছরের সময় তাঁর বিয়ে হয় আর ঐ বয়সেই স্বামিগৃহে আগমন করেন। এই বয়স থেকেই তিনি তাঁর গুণের পরিচয় দেন।

ভগবতী দেবীর অন্দর মহলের গুণের যেমন শেষ নেই আবার তেমনি বাইরের মহলের গুণেরও শেষ নেই।

পাড়াপড়শীদের তিনি স্নেহের চোখে দেখেন। তাদের প্রতি ভগবতী দেবীর সহানুভূতি, দরদ অসীম। অতি সহজেই এই নতুন বধূ সকলের মন জয় করেন। অনেক সময় পাড়াপড়শীরা ভগবতী দেবীকে কিছু দিলে, তা তিনি ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি মনে করতেন, তারা ভালবাসে বলেই তাঁকে জিনিস দিয়েছে। তাদের দেওয়া জিনিস তুচ্ছ, ছোট হতে পারে, তবু এর দাম অনেক। তাদের দেওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। এর দাম অনেক বেশী। এ মনে করেই তাদের দেওয়া জিনিস তিনি হাসিমুখে নিতেন। এইভাবেই তিনি তাদের প্রীতির বাঁধনে বেঁধেছিলেন।

অনেক সময় শাশুড়ী দুর্গা দেবী পাড়াপড়শীর কোন ত্রুটি, ভুল দেখলে রাগ করতেন। তখন বধূ ভগবতী দেবী শাশুড়ীকে বিনয়ের সঙ্গে বলতেন : 'মা, আপনি ওদের সামান্য অপরাধে ভুল দেখে রাগ করলে চলবে কেন? যাদের মুখ ভোরে উঠে দেখতে হয়, তাদের সঙ্গে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে রাগ করলে, তাতে আপনার দেবী চরিত্রের উপর দোষ পড়বে। ওদের ওসব তুচ্ছ কথা, তুচ্ছ অপরাধকে ক্ষমা না করতে পারলে, ওরা দাঁড়াবে কোথায়? ওদের কত সময় কত অন্যায় আবদার রক্ষা করেছেন......আর এখনই বা তা পারবেন না কেন? সবাই আপনাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে'......ভগবতী দেবীর এ কথায় শাশুড়ী দুর্গা দেবী আর কোন প্রতিবাদ করতেন না। শুধু একটু হেসে প্রাণভরে বৌমাকে আশীর্বাদ করতেন। আর আনন্দে তাঁর মন ভরে উঠত, একথা মনে করে : 'আমার বৌমায়ের মত আর কারো বৌ এ গাঁয়ে নেই!'—সত্যি, এতে এতটুকুও মিথ্যে নেই!

ভগবতী দেবী শুধু নামেই সার্থক নন; কাজেও সার্থকনাম্নী।

ভগবতী দেবীর সমবয়সীরা তাঁর স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা সব কিছুই লাভ করেছিল।

সবাই মনে করত, ভগবতী দেবী আমাকেই বেশী ভালবাসেন—কেননা, তিনি ছিলেন সবার দুঃখের সমব্যথী।

তাদের অসুখের কথা শুনলেই, তিনি তাদের কাছে ছুটে যান।

রোগীর রোগশয্যার পাশে বসে, তাকে সান্ত্বনা দেন। নিজের হাতে রোগীর সেবা করেন। ওষুধ পথ্যির ত কথাই ছিল না। নিজের পয়সা দিয়ে তাদের ওষুধ কিনে দিতেন। ওষুধ পথ্য বাড়ী থেকেই নিয়ে আসতেন। এভাবে সেবার ভিতর দিয়ে তাদের ভাল করে তোলেন।

কত অফুরন্ত দয়াই না ছিল তাঁর অন্তরে!

প্রাণী জগতের প্রতিও তাঁর টান ছিল। গৃহপালিত পশু পাখীর প্রতিও তিনি যত্ন নিতেন। দেখা যেত, বাড়ীর গরু, কুকুর, পোষ-মানা পাখীরা ভগবতী দেবীকে দেখে যেন আনন্দ প্রকাশ করত।

ভগবতী দেবীর লোক-সেবায়, ধর্মানুষ্ঠানে, দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রভাবে ঠাকুরদাসেরও সম্মান প্রতিপত্তি বাড়ে।

সংসারের সব কিছুর ভার ছিল ভগবতী দেবীর উপরে। তিনি একদিকে বুদ্ধিমতী ছিলেন, আরেক দিকে ছিলেন মিতব্যয়ী। শাশুড়ী জানতেন, পুত্রবধূ ভগবতী দেবীর আগমনে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। তারই গুণে গরীবের কুঁড়েঘর হয়ে ওঠে এক পুণ্যধাম।

নিস্তব্ধ রাত্রি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুধু এ বাড়ীর একজন নারী এখনও জেগে আছেন। আপন মনে চরকায় তিনি সুতো কাটেন।

এ নারী এ-বাড়ীর বধূ—ভগবতী দেবী।

এ সব দেখে মনে হয়, স্বর্গের দেবতাদের করুণাধারাও ঝরে পড়ত এ শান্তিপূর্ণ পুণ্যধামে।

আতিথেয়তা, দয়া, ধর্ম, সততা

নিজেদের সাংসারিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। কোন-ভাবে দিন চলে, কি চলে না।

এই অভাব অনটনের মাঝ দিয়েই দিন চলে। এমনি দিনে এক ক্ষুধাতুর ও তৃষাতুর ব্রাহ্মণ এসে বাড়ীতে হাজির হলেন।

তাইত, কি করা যায়?—দুর্গাদেবী ভারী ভাবনায় পড়েন। তিনি আগত ব্রাহ্মণকে সরলভাবে নিজের দুঃখ-দৈন্যের কথা বললেন: 'আপনি আমার বাড়ীতে একজন মানী অতিথি...আমি ভাগ্যবতী। আপনাকে কি বলবো? আমার সন্তানেরা কোনদিন একবেলা খাচ্ছে, কোন বেলা খেতে পাচ্ছে না। আপনার সেবা করতে পারলে কৃতার্থ হ'তাম।' কথাগুলি অশ্রুসজল কণ্ঠে শেষ করেন।

ভগবতী দেবী দরজার আড়াল থেকে শাশুড়ীর সব কথা শুনতে পান। তাঁরও চোখ দুটি সজল হয়ে আসে।

ভগবতী দেবী শাশুড়ীকে বললেন : 'মা, অতিথিকে ফেরাবেন না। ওঁকে বসতে আসন দিন। আমি ওঁর আহারের কি ব্যবস্থা করতে পারি দেখি—' এই বলে ভগবতী দেবী পাড়ার এক পড়শীর বাড়ী গেলেন।

তিনি তাঁর হাতের এক গাছি পিতল-পৈঁছা তাকে দিয়ে বললেন : 'এটা রেখে আমাকে এক সের চাল দাও—।' পড়শী তাঁকে চাল দিলেন। তারপর তিনি সে চালের অর্ধেকটা মুদির দোকানে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি ঐ দিয়ে ডাল আনলেন। পরে চালে ডালে তিনি উনুনে বসিয়ে দেন। যথাসময়ে রান্না শেষ হল।

ভগবতী দেবী ব্রাহ্মণের আহারের ব্যবস্থা করেন। ব্রাহ্মণ খেতে বসলেন। তিনি তৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করলেন।

অনেক রাত্রি হয়েছে। ব্রাহ্মণ কোথায় যাবেন?

ভগবতী দেবী দুর্গাদেবীকে বললেন : 'মা, আমাদের থাকবার মতন তেমন ঘর নেই। পাড়ায় কারও বাড়ীতে ব্রাহ্মণের এ রাত্রির মত থাকবার ব্যবস্থা করে দিন।...'

দুর্গাদেবী অতিথির রাত্রি কাটাবার জন্য সেই ব্যবস্থা করে দেন।

পরদিন। ভোর হয়েছে। ব্রাহ্মণও ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন। তিনি দুর্গাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন। তিনি দুর্গাদেবীকে বললেন : 'আমি আপনাদের আতিথ্যে খুব প্রীতি লাভ করেছি।—' এই বলে ব্রাহ্মণ তাঁর উপবীত খুলে সূর্যদেবের দিকে তাকিয়ে বললেন : 'হে সূর্যদেব! তুমি এ জগতে আলো বিতরণ কর, তাই এ জগৎ আলোকিত হয়ে আছে। এই বালিকা-বধূর দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা, সেবা ফল্‌গুনদীর ধারার মত তাঁর অন্তরে প্রবাহিত। হে সূর্যদেব, এই বধূ যেন ধনে, বংশে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।'—এই বলে ব্রাহ্মণ সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

এই ঘটনার পর থেকে তাঁদের সংসারে শ্রীবৃদ্ধি হ'তে থাকে।

এ বাড়ীতে অতিথি এলেই ভগবতী দেবী নিজের হাতে অতিথির সব কাজ করেন। অতিথির যেন কোন অসুবিধে না হয়, সে দিকেই তাঁর দৃষ্টি থাকে। তিনি অতিথির সুখ সুবিধের জন্য সতত চেষ্টা করেন। আপন সুখ সুবিধের কথা তাঁর মনেও আসে না।

আপন পরিবারের প্রতিও তাঁর সতত দৃষ্টি ছিল। সকলকে সমান আহার্য দ্রব্য দিতেন। এ দেওয়ার মধ্যে কোন বৈষম্য নেই। রান্না থেকে পরিবেশন একাই করে চলেন।

যাঁরা আশ্রিত ও অতিথি তাঁদের যথাসময়ে খেতে দেন।

তারপর এক সময়ে ভগবতী দেবী বাড়ীর বাইরে দুয়ারে এসে দাঁড়ান। যারা হাটে বাজারে গিয়েছে, তাদের ফিরে আসার পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে কারো শুকনো মুখ দেখলেই, তাকে ডেকে তিনি বলেন : 'তোমার বুঝি এখনও খাওয়া হয়নি? আমাদের বাড়ীতে খেয়ে যাও—!' এমনি করে তিনি খোঁজ নেন, কে খেয়েছে, না খেয়েছে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, পরের জন্য এমন

দরদ দিয়ে ভুক্ত, অভুক্তর খবর কে নিয়ে থাকে? বাড়ীতে নিজের লোক যারা, তারা না খেয়ে থাকলেও, একটিবারও কেউ জিগ্যেস করে না, খাওয়া হয়েছে কি, না হয়েছে! তারা সব সময় নিজেদের স্বার্থ নিয়েই মেতে থাকে। ভগবতী দেবীর আপনজন তারা কেউ ছিল না, অথচ তিনি তাদের জন্য রয়েছেন না খেয়ে। কারো মুখখানা তিনি শুকনো দেখলেই বুঝেন, তার মনের কথা। তাই ভগবতী দেবী ছিলেন 'সবার মা'!

আবার তাঁর বিচার-শক্তি দেখেও অবাক হতে হয়। কোন অতিথির প্রতি কী আচরণ করা দরকার, সেদিকেও তাঁর লক্ষ্য ছিল।

একবার এক স্কুল পরিদর্শক তাঁদের বাড়ীতে আসেন। তাঁদের বাড়ীতেই তিনি অতিথি হলেন। ভগবতী দেবী তাঁকে থালা করে খেতে দিলেন। তাঁর সঙ্গে আর যাঁরা খেতে বসেছিলেন, তাঁরা কিন্তু পাতাতেই খাচ্ছিলেন। এরূপ ব্যবধান দেখে স্কুল পরিদর্শক মশায় একটু বিস্মিত হলেন।

তিনি জিগ্যেস করলেন : 'আমাকে থালায় করে কেন ভাত দিলেন? আর ওদেরই বা পাতাতে কেন খেতে দিলেন? আমাকেও পাতাতে করে খেতে দিন।—'

এ কথায় ভগবতী দেবী মৃদু হেসে বললেন : 'তুমি বড় ঘরের ছেলে। তুমি ওদের সঙ্গে খেতে বসে যে পাতায় করে খেতে চাইলে, তাতে আমি ভারী খুশী হয়েছি। আমার মনে হয়, তোমার সত্যিকার জ্ঞান লাভ হয়েছে।—'

হ্যারিসন সাহেব। ইন্‌কাম ট্যাক্স অফিসার। তিনি মেদিনীপুরে এসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে আগেই তাঁর কলিকাতায় পরিচয় হয়েছিল। সাহেবের আগমনের কথা ঈশ্বরচন্দ্র ভগবতী দেবীকে বলেন। হ্যারিসন সাহেবের গুণের কথা শুনে ভগবতী দেবী ছেলেকে বললেন : 'তুই একবার সাহেবকে আমাদের বাড়ীতে আসতে বলিস। আমাদের বাড়ীতে অতিথি হলে ভাল হত। তাঁকে কিছু খাওয়ানো যেত।—'

মায়ের কথায় তিনি সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। কথা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের মায়ের আমন্ত্রণের কথা শুনে ভারী খুশী হলেন। তিনি বললেন : 'মা নিজে না বললে, আমি যাব না।—'

তাই হ'ল! ভগবতী দেবী হ্যারিসন সাহেবকে চিঠি লিখলেন :—

শ্রীশ্রীহরি শরণং

অশেষ গুণপ্রিয়,

শ্রীযুত এচ, এল, হ্যারিসন মহোদয়,
পরম কল্যাণভাজনেষু,

সস্নেহ সম্ভাষণমাবেদনমিদম্,

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট শুনিলাম, আপনি সত্বর কলিকাতায় প্রতিগমন করিবেন। আমার নিতান্ত মানস দয়া করিয়া তৎপূর্বে একবার বীরসিংহের বাটিতে আগমন করেন। তাহা হইলে আমি যারপরনাই আহ্লাদিত হই। প্রার্থনা এই আমার বাসনা পরিপূরণে বিমুখ হইবেন না। ইতি ২ ফাল্‌গুণ, ১২৭৫ সাল।

শুভাকাঙ্ক্ষণী
শ্রীভগবতী দেব্যাঃ

ভগবতী দেবীর চিঠি পেয়ে হ্যারিসনের আনন্দের সীমা নেই। মা তাঁকে নিজের হাতে চিঠি লিখেছেন যেতে—এর চেয়ে আর কী বড় জিনিস হতে পারে? তিনি মনে করলেন যে যত কাজই থাক্, মায়ের সঙ্গে দেখা করাই হ'ল সবার বড় কাজ।

সাহেব বাঙলা জানতেন ও বাঙলায় কথাও বলতে পারতেন।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় ছিলেন। সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বীরসিংহ গ্রামে আসেন। সাহেব ভগবতী দেবীকে দেখে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করেন।

ভগবতী দেবী নিজের হাতেই রান্না করেছেন। নিজেই তাঁকে পরিবেশন করেন। আর তিনি সাহেবের পাশে বসেন। নিজের ছেলের মত সাহেবকে খাওয়াতে বসলেন।

এ সব দেখে সাহেব ভারী আশ্চর্য হলেন। আপন দেশ ছেড়ে, আপন মা, বাবা, আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে হ্যারিসন সাহেব এদেশে এসেছেন। আজকের এই গৃহের পরিবেশে ও ভগবতী দেবীর স্নেহে হ্যারিসন সাহেব যেন অভিভূত হয়ে পড়েন। আপন মায়ের স্নেহ, ভালবাসা সাহেব ভগবতী দেবীর কাছ থেকে লাভ করেন। সাহেব

আরও বিস্মিত হলেন এই দেখে যে ভগবতী দেবী একজন নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণী অথচ তাঁর মধ্যে কোন সংস্কার নেই। সংস্কার-মুক্ত এই ভগবতী দেবীর প্রতি সাহেবের ভক্তি, শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই তাঁর পায়ে নুয়ে আসে। বিদেশী অনাত্মীয় অতিথিকেও ভগবতী দেবী তাঁর স্নেহ, মায়া, মমতায় আপন করে নিয়েছেন।

ভগবতী দেবীর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের মহিমার তুলনা আর কোথাও দেখা যায় না।

হ্যারিসন সাহেব এর আগে বহু জায়গায় ভোজন করেছেন। অনেক ধনী মানীর বাড়ীতে গিয়েছেন। ধনাঢ্যদের গৃহে রাজকীয় ভোজও খেয়েছেন। তাঁদের সমাদর, আপ্যায়নও পেয়েছেন তিনি।

সাহেব আজ ভগবতী দেবীর গৃহে আগমন করে এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। ভগবতী দেবীর আন্তরিকতার মধ্যে ছিল সত্যিকার নিষ্ঠা। এই আন্তরিকতার কাছে ধনীর বাহ্যিক অনুষ্ঠান ম্লান ও নিষ্প্রভ হ'য়ে আসে।

হ্যারিসন সাহেব চেয়ারে বসেন নি। তিনি টেবিলের উপর থালা রেখে ভোজন করেন নি। মাটিতে একখানা আসন পেতেই তিনি তাতে বসলেন। ঐ আসনে বসেই তিনি অতি তৃপ্তির সঙ্গে আহার করলেন।

সাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন: 'আপনার মায়ের এই উদারতা, স্নেহ ও ভালবাসা আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। আমি আপনার মায়ের এই আদর, যত্ন কোনদিন ভুলব না।—'

ভগবতী দেবী সাহেবকে বললেন: 'দেখ বাছা, তুমি যে কাজ কর, সে কাজ বড় কঠিন। খুব সাবধানে বুঝে সুঝে তা করো। গরীব দুঃখীদের কথা সব সময় মনে রেখো। তারা যেন তোমাকে আপন জন বলে মনে করতে পারে। তুমি ওদের দুঃখের কথা মন দিয়ে শুনে, তাদের দুঃখ যেন দূর করতে পার। মনে করবে, তুমি তাদের দরদী ও দুঃখের বন্ধু।—'

হ্যারিসন সাহেব মন দিয়ে তাঁর কথাগুলি শুনলেন। এই বিদেশে, বিভুঁয়ে হ্যারিসন সাহেব রয়েছেন। কই, কোনদিন কেউ তাঁকে এত দরদ দিয়ে এ সব কথা বলেন নি। ভগবতী দেবীর এই সব কথা থেকেই সহজেই ধরা যায় যে তিনি সাহেবের কত হিতার্থী ছিলেন।

কোন কাজে সাহেবের সুনাম হতে পারে, কি করলে সবাই সাহেবকে সুখ্যাতি করবে,—এই ধরনের কথা সাধারণত মা ছেলেকেই বলে থাকেন। আজ এই সুদূর বিদেশে তিনি তাঁর মাকেই যেন এই ভগবতী দেবীর মধ্যে দেখতে পান। ভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাঁর হৃদয় আপ্লুত হয়ে ওঠে।

গৃহের পারিপাট্য, সুরুচিপূর্ণ বেশবাস ও শৃঙ্খলা দেখে সাহেবের মনে প্রশ্ন জাগে, বিদ্যাসাগরের মায়ের হয়ত অনেক টাকা আছে।

এ-কথা, সে-কথা বলতে বলতে সাহেব ভগবতী দেবীকে প্রশ্ন করেন: 'আপনার কত ঘড়া সম্পদ আছে?' হ্যারিসনের এই কথায় ভগবতী দেবী মৃদু হাসলেন। সলজ্জ ভাবে তিনি বললেন: 'কেন, আমার চার ঘড়া ধন আছে।' সাহেব কিন্তু তাঁর এই কথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। ভগবতী দেবী তখন সাহেবকে ঈশ্বরচন্দ্র, দীননাথ, শম্ভুনাথ ও ঈশানচন্দ্র এই চার ছেলেকে দেখিয়ে বললেন: 'এই চার ছেলেই আমার চার ঘড়া ধন!'

ভগবতী দেবীর এই কথায় হ্যারিসন খুব বিস্মিত হলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন: 'আপনার মা সাধারণ স্ত্রীলোক নন!'

এমন মা পেয়েছিলেন বলে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' আর 'দয়ার সাগর' হয়েছিলেন।

সব জিনিসেরই শেষ আছে। ভগবতী দেবীর দয়া ও দানের কিন্তু শেষ নেই। তাঁর অসীম দয়া ও অফুরন্ত দান কত দিকেই না ছড়িয়ে আছে। তাঁর দয়া ও দানের তুলনা কোথাও মেলে না।

গাঁয়ের অনেকে ভগবতী দেবীর কাছ থেকে টাকা ধার নিত। তিনি যখন কাউকে টাকা ধার দিতেন, তা ফেরত পাবেন বলে মনে করতেন না। কেউ ধার শোধ করতে না পারলে, তিনি তার কাছে আর টাকা চাইতেন না। এমন কি, টাকা ধার দেওয়া হয়েছে, তা-ও তাকে বলতে দিতেন না। টাকার দরকার পড়লে, আবার তিনি তাকে টাকা ধার দিতেন। ভগবতী দেবী টাকা ধার দিতেন কিন্তু টাকা আদায় করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। পরের উপকার করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

অনেক সময় অনেকে ধারের টাকা দিতে না পারায়, তারা নিজেকে খুব বিব্রত মনে করত।

তিনি তাদের অভয় দিয়ে বিনয়ী সুরে বলতেন : 'আহা, এ জন্যে দুঃখ করছ কেন? সময় ভাল হলেই টাকা দিও।—'

অনেক সময় ভগবতী দেবী টাকা পাবার আশায় তাদের কাছে টাকা চাইতেন। দেখা যেত, তাদের মধ্যে কেউ বা এক টুকরো হলুদ বেটে, ভগবতী দেবীর হাতে পায়ে মাখিয়ে দিত। আবার কেউ বা তাঁর কাপড়ের আঁচলে বেঁধে দিত চিঁড়ে, মুড়ি। তিনি হাসিমুখে তাদের দেওয়া জিনিস হাত পেতে নিতেন। তাদের দেওয়া জিনিস কখনও তুচ্ছ মনে করে ফিরিয়ে দেন নি। তাদের দেওয়ার ভিতর ছিল তাদের প্রাণের টান। ভক্তি, শ্রদ্ধা সহকারে যে যা দেয়, তাকে কখনও অবহেলা করতে নেই, এ কথাটা ভগবতী দেবীর ভাল করেই জানা ছিল। তাদের এই ধরনের আদর, আপ্যায়নে তিনি টাকা আদায়ের কথা ভুলে যেতেন।

দেখা যেত, বাড়ী ফেরবার পথে তিনি তাদের ডেকে ডেকে বলে আসতেন : 'আজ তোরা সবাই আমাদের বাড়ী যাবি। আর সবাই আমাদের বাড়ীতে খাবি কিন্তু।'

ধারের টাকা আদায় করতে গিয়ে তিনি তাদের দুঃখের অভাবের কথাই শুনে আসতেন। কি ভাবে তাদের দুঃখ দূর করা যায়, তা-ই আবার ভাবতেন।

কী আশ্চর্য চরিত্রের মহিলাই না ছিলেন ভগবতী দেবী!

ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ীর সামনে ভীড় জমে। ছেলে, বুড়ো, শিশু সবাই বলছে : 'আমাদের খেতে দাও! ক্ষিদে পেয়েছে।' ভগবতী দেবী তাদের করুণ আর্তনাদে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না।

করুণাময়ী ভগবতী দেবী কী করেই বা পারবেন? তিনি যে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা দেবী! ভগবতী দেবী বাড়ীতে একটি অন্নসত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই রান্না করেন। পরিবেশনও করেন তিনি-ই।

ক্ষুধার্ত, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতেরা তৃপ্তি ভরে আহার করে। তাদের মুখে হাসি ফুটে। তারা বলে : 'তুমিই মা, আমাদের সাক্ষাৎ

অন্নপূর্ণা!' তাদের আনন্দে তিনিও আনন্দিত হন। এমন কী, তাঁর চোখ দুটি আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছল্ ছল্ করে উঠে।

সেদিনকার ছোট বীরসিংহ পল্লীকে মনে হত কাশীধামে পরিণত হয়েছে। এ যেন পুণ্যধাম কাশীর অন্নপূর্ণার আরেকটি প্রতিচ্ছবি ভগবতী দেবীর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভগবতী দেবীর মেয়েরাও মার সঙ্গে অন্নসত্রের কাজে এগিয়ে আসেন। মেয়েরাও শরণার্থীদের খোঁজ খবর নেন।

এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বৈষম্য ছিল না। সবাই এক। এই মহামিলন তীর্থে সবাই অবাধে আসত। হাড়ি, মুচি, বাগদী, কুলী বলে ভেদাভেদ ছিল না। সবাই সমানভাগে আহার পেত। অন্নসত্রের একদিকে ভগবতী দেবীর মেয়েরাও আশ্রিতা মেয়েদের খোঁজ খবর নেন। তাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, তাঁরা সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। যে সব মেয়েরা চুলে তেল মাখতে পারে নি, মাথায় তাদের জট হয়েছে, তাদের চুলে মেয়েরা তেল মাখিয়ে দেন। ভগবতী দেবীর মেয়েরাই চিরুণী দিয়ে তাদের চুল গোছগাছ করে দেন। আরেক দিকে ভগবতী দেবী সধবাদের কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দেন।

এই অন্নসত্রে ভগবতী দেবীর কাজের আর শেষ নেই। তাছাড়া তিনি গ্রামের লোকদের খবর রাখেন। এই দুর্ভিক্ষে তাদের মধ্যে অনেকেই কাপড় অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। অথচ লজ্জায় তারা মুখ ফুটে কাউকে নিজেদের অভাব, অভিযোগের কথা বলতেও পারে না। ভগবতী দেবী তাদের খবর নেন। যাদের কাপড়ের অভাব, তাদের কাপড় দিয়ে লজ্জা দূর করেন। এসব কাজ তিনি অতি গোপনে করেন। তাদের লজ্জা, মান, মর্যাদাকে তিনি এভাবে রক্ষা করেন।

গ্রামের লোকের প্রতি তাঁর কী করণীয়, তা তিনি জানতেন। কাজেই গ্রামের যে-টুকু সংবাদ নিতেন, তাতে দেখতে পেতেন এই দুর্দিনে অনেকেই অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন অতিবাহিত করছে। তিনি তাঁর যথাসাধ্য তাদের অন্নাভাব ঘুচাতে চেষ্টা করেন।

এ সব কাজে অনেক টাকা দরকার পড়ে। অন্নসত্রে ও দানে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। আরও টাকা চাই! এদিকে টাকাকড়ি কমে এসেছে। ঈশ্বরচন্দ্র এবিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।

একদিন ঈশ্বরচন্দ্র মাকে ডেকে বললেন: 'মা, আমি ভেবে

দেখেছি, আমাদের পুজো পার্বনে যে টাকা খরচ হয়, সে টাকা বাঁচিয়ে আমরা এই অন্নসত্রের কাজে খরচ করতে পারি। তুমি যদি বল, তবে এ বছর জগদ্ধাত্রী পুজো বন্ধ করে ঐ ছয় সাতশ টাকা গরীব দুঃখীদের কাজে লাগাতে পারি।—'

একথা শুনে মা বললেন: 'ঈশ্বর, তুই ঠিক কথাই বলেছিস! এত ঘটা করে পুজোতে খরচ করা মিছে। ঐ টাকা দিয়ে ওদের খাওয়াতে পারলে, ওদের বাঁচানো যায়। ওরা খেয়ে বাঁচলে ঠাকুর খুশী হবেন। নারায়ণ ত ওরাই!'

মায়ের আদেশ পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্রও আনন্দিত হলেন। সে বছর বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পুজো বন্ধই ছিল। পুজোর টাকা বাঁচিয়ে তিনি গরীব দুঃখীদের খাওয়ালেন।

মা ছেলের উপর আরেকটা কাজের ভার দিলেন। তিনি বললেন: 'ঈশ্বর, এই গাঁয়ে যারা অভাবে, অনটনে দিন কাটাচ্ছে, তাদের যদি মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে পারিস, তবে ওদের বড় উপকার হয়।'

মার কথায় ঈশ্বরচন্দ্র ভারী খুশী হলেন। তিনি মাকে বললেন: 'মা, তুমি কিছু ভেবো না। আমি সব ব্যবস্থা করছি।—'

ঈশ্বরচন্দ্র তখন গ্রামের কয়েকজন মাতব্বরদের ডেকে পাঠালেন।

তারা তখনই হাজির হল। তিনি তাদের বললেন: 'তোমাদের উপর একটা কাজের ভার দিচ্ছি। তোমরা এ গাঁয়ের সবার বাড়ীতে বাড়ীতে যাবে, আর কে কী অভাবে দিন কাটাচ্ছে, তাদের পরিবারের কতজন লোক, কে কী করে, এই সব খোঁজ খবর নিয়ে তাদের নাম সহ আমাকে বিস্তারিত বিবরণী দিবে। এই কাজ দু'চার দিনের মধ্যে শেষ করা চাই কিন্তু।'

যথাসময়ে তারা গাঁয়ের অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা ঈশ্বরচন্দ্রকে দেয়।

তারপর থেকে তিনি মাসে মাসে তাদের মাসহারা দিয়ে তাদের সাহায্য করতে থাকেন।

মা ও ছেলে কেউ ধনী নয়। অথচ ধনীর চেয়েও তাঁরা বড় কাজ করেছেন।

অর্থে ধনশালী হওয়া যায় কিন্তু কাজে মহৎ হ'তে হলে চাই ভগবতী দেবীর মত মাতা আর ঈশ্বরচন্দ্রের মত পুত্র।

শীতের সন্ধ্যা।

উত্তুরে হিমেল হাওয়া বইছে কন্ কন্ করে। এই হাড়-কাঁপুনি শীতেও ভগবতী দেবী সব সময়েই কাজে রয়েছেন ব্যস্ত। চুপচাপ বসে থাকা তাঁর অভ্যাস নেই। কাজ করাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। বিশ্রাম বলে তাঁর কিছু নেই। একা ঘরে বসে চরকা কাটছেন।

একদিন এই শীতের সন্ধ্যায় এক অনাথা স্ত্রীলোক তাঁর বাড়ীতে এসে হাজির। তার কোলে একটি শিশু সন্তান। মা শিশুকে বুকে চেপে ধরেছে। শীতে মা কাঁপছে। শিশুও শীতে কাঁপছে। কারও গায়ে শীতের আবরণ নেই। মার পরণে যে কাপড়-খানা, তাও ছেঁড়া ও ময়লা। কোন রকমে মা লজ্জাকে ঢেকে রেখেছে।

স্ত্রীলোকটি করুণ কণ্ঠে ডাকে : 'মা শীতে বড্ড কষ্ট পাচ্ছি।'

তার এই করুণ ডাক ভগবতী দেবীর কানে যায়। তিনি তখনই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন। ঐ অনাথা মা ও শিশুর এই অসহায় দশা দেখে তাঁর চোখে জল আসে। তিনি আবার ঘরের ভিতরে গেলেন। তাড়াতাড়ি করে তিনি ঘর থেকে একটি গরম চাদর নিয়ে আসেন। অসহায়া স্ত্রীলোকটিকে চাদরখানা দিয়ে সস্নেহে বলেন : 'এই নাও। এটা গায়ে দাও। ঐ কচি ছেলেটি বাঁচবে এ শীতে।'

স্ত্রীলোকটি চাদরখানা বার বার করে দেখে। চাদরখানা সে গায়ে দিয়ে শিশু সন্তানকে জড়িয়ে ধরে বুকে। ভগবতী দেবী তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলেন। আর মনে মনে বলেন : 'সত্যি, ওরা কত দুঃখী!'

ভগবতী দেবী তাঁর এ দানের কথা কাউকে বলেন নি।

আজই ঐ নতুন গায়ের চাদরখানা তাঁর জন্য কেনা হয়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন, ঐ চাদরখানা শীতে গায়েও দিতে পারবেন; আবার শীতের রাত্রিতে গায়ে দিয়েও ঘুমোতে পারবেন।

এই অসহায়া স্ত্রীলোকটি আর তার শিশুকে চাদরখানা দিয়ে শীতের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন, একথা মনে করে, ভগবতী দেবী নিজের শীতের কষ্টের কথা একেবারেই ভুলে গেলেন।

পরের দুঃখ মোচনে নিজের জিনিস অকাতরে বিলিয়ে ক'জন আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন?

বিদ্যাসাগর মশায় তখন কলিকাতায় থাকেন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করেন তিনি।

শীত এসেছে। বাড়ীর জন্য ছয়খানা লেপ কেনেন। মার নামে তিনি লেপ ক'খানা পাঠালেন। মার জন্য তাতে একখানা লেপ ছিল। আর পাঁচখানা ছিল বাড়ীর পাঁচজনের জন্য।

ভগবতী দেবী লেপ ক'খানা পেয়ে ভারী খুশী হলেন। সেবার বীরসিংহ গ্রামে খুব শীত পড়েছিল। গরীব প্রতিবেশীরা শীতে খুব কষ্ট পাচ্ছিল। ভগবতী দেবী তাদের শীতে কষ্ট দেখে ভাবছিলেন, কী করে তাদের শীতের কষ্ট দূর করা যায়। এমনি সময়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের লেপ ক'খানা ভগবতী দেবী পেলেন।

ভগবতী দেবী লেপ ক'খানা হাতে নিয়ে ভাবলেন : 'এই শীতে আমরা সবাই লেপ গায়ে দেব? ঐ গরীব বেচারাদের লেপ নেই। ওদের পয়সা কড়ি নেই। শীতে ভারী কষ্ট পাচ্ছে।' ঐ কথা মনে করে ভগবতী দেবী দুঃখ বেদনায় ভেঙে পড়েন : সত্যি, তিনি লেপ গায়ে দিতে পারলেন না। এমন কি বাড়ীর পাঁচজনের যে পাঁচখানা লেপ, তাও তাদের দিতে পারলেন না। ঐ ছয়খানা লেপ গরীব প্রতিবেশীদের ডেকে বিলিয়ে দিলেন।

আর সহানুভূতির স্বরে তিনি বললেন : 'বাছারা, এখন এই ছয়খানা লেপ পেয়েছি, তাই তোদের দিচ্ছি। রাতে তোরা গায়ে দিস।'

তারপর...

ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখলেন : 'ঈশ্বর তোর পাঠানো লেপ ছয়খানা পেয়েছি। আমাদের দুঃস্থ প্রতিবেশীরা এবার শীতে বড় কষ্ট পাচ্ছে। আমরা ওদের ফেলে এই শীতে কী করে লেপ ব্যবহার করি? তাই ওদের লেপ ক'খানা দিয়ে দিয়েছি। আমাদের জন্য লেপ পাঠাস।—'

ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের চিঠি পেলেন। মাকে তিনি আবার লিখলেন : 'মা, তোমার ও বাড়ীর লোকদের সব সমেত ক'খানা লেপ পাঠাবো?

দুঃস্থ প্রতিবেশীদের জন্য ক'খানাই বা লেপ পাঠাতে হ'বে, লিখো। তোমার চিঠি পেলেই পাঠিয়ে দেব।'

ঈশ্বরচন্দ্র আরও একশ'খানা শীতের কম্বল কিনে মার নামে পাঠিয়ে দেন।

ভগবতী দেবী যে দরদ ও দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পরের দুঃখ দেখতে পেতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও অনুরূপ সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গরীব দুঃখীর দুঃখ, কষ্ট উপলব্ধি করতেন। ভগবতী দেবীর সহানুভূতি, অনুভূতি ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল।

মা তখন-ই বড় হয়েছেন যখন-ই মায়ের সদ্‌গুণাবলী ছেলে অধিকার করতে পেরেছে।

ভগবতী দেবীর আদর্শেই ঈশ্বরচন্দ্র গঠিত হ'ন। একদিন ঈশ্বরচন্দ্রও বড় হলেন আর মাতা ভগবতী দেবীও বড় হলেন।

বামনী—।

বীরসিংহ গ্রামের একটা পুকুর।

এই পুকুর-ঘাটে ভগবতী দেবী প্রায়ই স্নান করেন। সেদিনও তিনি এই পুকুরে স্নান করতে আসেন। তাঁর স্নানের আগে অন্য গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ এই পুকুরে স্নান করেন। আবার এই ঘাটে বসেই তিনি আহ্নিক কাজ সমাধা করে বাড়ী ফিরেন।

ভগবতী দেবী স্নান শেষ করে ঘাটে উঠেছেন। এমনি সময়ে তিনি দেখতে পান, ঘাটের সিঁড়ির একটি ধারে একটি থলে পড়ে আছে। কি মনে করে থলের মুখটা তিনি খোলেন। থলের ভিতর তিনি দেখতে পান এক জোড়া নূতন শাড়ী, এক জোড়া কানের দুল আর নগদ চল্লিশটি টাকা।

ভগবতী দেবী ভারি ভাবনায় পড়েন। 'তাইত কী করা যায়?' —তিনি এক মহা সমস্যায় পড়েন। থলের মুখ বন্ধ করে তিনি থলে নিয়ে বসে থাকেন। ভগবতী দেবী এ ধরনের বিপদে কখনও পড়েন নি। এ থলে ফেলে যেতে পারছেন না, আবার তিনি নিয়ে যেতেও পারছেন না। তিনি উভয় সংকটে পড়েন।

শেষ পর্যন্ত ভগবতী দেবীর আর বাড়ী যাওয়া হয় না। ভগবতী দেবী জানতেন, থলের মালিকের যখন থলের কথা মনে

পড়বে তখন সে ছুটে আসবেই থলের খোঁজে।

কিছুক্ষণ পর এক ব্রাহ্মণ ছুটতে ছুটতে পুকুর ঘাটে এসে হাজির হলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন: 'আমি একটা থলে ঘাটে ফেলে গেছি!—'

ভগবতী দেবী থলে দিয়ে বললেন: 'ঐ যে আপনার থলে।'

থলে ফেরত পেয়ে ব্রাহ্মণের খুব আনন্দ হ'ল। তিনি ভগবতী দেবীকে বললেন: 'আপনি না দেখলে, আমি এ থলের জিনিস কখনও পেতাম না। আমার মেয়ের বিয়ে তাই মেয়ের জন্য এ শাড়ী; এ কানের দুল আর এই ক'টা টাকা যোগাড় করেছি। কন্যাদায়গ্রস্ত আমি, তাই মনে আমার শান্তি নেই।'

এ কথায় ভগবতী দেবী বলেন: 'আমার আতিথ্য গ্রহণ করলে খুব খুশি হব।'

অতিথি ভগবতী দেবীর অনুরোধ এড়াতে পারেন না।

তিনি সমাদর করে অতিথিকে খেতে দিলেন। অতিথি খেয়ে দেয়ে ভারী আনন্দিত হলেন।

ভগবতী দেবী জিগ্যেস করলেন: 'আপনার মেয়ের বিয়েতে যে টাকা যোগাড় করেছেন, তাতে কি কাজ হ'বে?'

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন: 'মা, আর কুড়ি টাকা হ'লেই চলবে—!'

তিনি অতিথিকে বলেন: 'দেখুন কুড়ি টাকা আপনার কম পড়েছে, তা আমি আপনাকে দিচ্ছি, এই নিন—!'

ব্রাহ্মণ তাতে বলে উঠেন: 'তা কি করে হয় মা?'

'মনে করুন, আমার মেয়ের বিয়ে বলে মনে করছি।'

ব্রাহ্মণ একথার আর প্রতিবাদ করেন না। তিনি হাত পেতে ভগবতী দেবীর দেওয়া কুড়ি টাকা গ্রহণ করেন।

তিনি শুধু টাকাই দান করেন, তা নয়, তিনি তাঁর শুভেচ্ছাও জানালেন ব্রাহ্মণের মেয়ের বিয়েতে। তিনি ব্রাহ্মণকে বললেন: 'মেয়ের মঙ্গলমত বিয়ে হ'ক এ কামনা করি।—'

তাঁর সাধুতা, আতিথেয়তা, দয়া, দান আর শুভেচ্ছা কতই না!

বিদ্যাসাগর মশায় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছেন। এখন তিনি মাসে তিনশ টাকা বেতন পান। তা'ছাড়া তিনি বই লেখেন। সে সব বই থেকেও তিনি টাকা পান। এখন তাঁদের সাংসারিক

অবস্থা ভালই চলছে। তিনি দুঃখের দিনগুলির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছেন। কত অভাব, কত অভিযোগের সঙ্গেই না এ সংসারে চলতে হয়েছে। কতদিন ভাই বোনেরা পেট ভরে খেতেও পায় নি। ঠাকুরদাসকে চাকরীর খোঁজে আসতে হয়েছে কলিকাতায়। পরের বাড়ী থেকে, পরের মন যুগিয়ে কাজ করেছেন ঠাকুরদাস। ঈশ্বরচন্দ্রও পিতার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন বিদেশে। তিনি ভাত রান্না করে দিয়েছেন পিতাকে, বাসন মেজেছেন নিজের হাতে। পথের গ্যাস পোস্টের আলোতে পড়াশোনা করেছেন তিনি। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর ভবিষ্যতের পথ তৈরী করে নিয়েছিলেন।

দুঃখের মধ্যে থেকে কী করে সংগ্রাম করে জয়ী হতে হয়, তা একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্রের কার্যাবলীতে দেখি। তিনি সবখানে বজায় রেখেছেন নিজের বৈশিষ্ট্য, স্বাধীনতাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি। তিনি মাথা উঁচু করে এগিয়ে গিয়েছেন কর্মপথে।

কত দুঃখের পর না তিনি সুখের পথ পেলেন! আজকের দিনে তাঁর ইচ্ছা হয়, মাকে সোনাদানা দিয়ে সাজান।

তাই একদিন ঈশ্বরচন্দ্র মাকে জিগ্যেস করেন : 'মা, তোমার আশীর্বাদেই আজ বড় হয়েছি। সংসারের অবস্থাও অনেক ফিরেছে। তাই মা, আমার বড় সাধ, তোমাকে কিছু দেই। মা, তোমার কী কী গয়না পরবার সাধ হয়, তা আমাকে বল।—'

ছেলের ঐ কথা শুনে মা একটু হেসে বললেন : 'ঈশ্বর, তোর বুঝি সাধ হয়েছে তোর মাকে গয়না গাঁটি পরাস?'

'হ্যাঁ, মা!' ঈশ্বরচন্দ্র বললেন মাকে।

'বেশ ত! তুই যখন গয়না গড়িয়ে তোর মাকে দিতে চাস, তখন এর চেয়ে আমার আনন্দ আর কী আছে! এতদিন সুযোগ সুবিধে হয়নি বলে তোকে বলতে পারিনি।—' এই বলে মা ছেলের কাছে তিনখানা গয়না দাবী করেন : 'দেখ বাবা, গাঁয়ের ছেলেগুলোর কী দশা। ওরা মূর্খ হতে চলেছে। গাঁয়ের ছেলেদের জন্য বিনে পয়সায় একটা বিদ্যালয় গড়ে দে। এই একটি বড় সাধ।—'

'বেশ ত, মা তাই হবে—!' ঈশ্বরচন্দ্র বললেন।

'আরেকটা সাধ রয়েছে, এ গাঁয়ে গরীবদের অসুখ-বিসুখে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। এর অভাবে অনেকেই অসময়ে মারা

যায়। এ গাঁয়ে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করে দে!—'

'গাঁয়ে যাতে দাতব্য চিকিৎসালয় হয়, তাই মা করে দিচ্ছি—' ঈশ্বরচন্দ্র সানন্দে সম্মতি দিলেন।

'আর দেখ, গরীব ছেলেরা কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে, এ থাকা, খাওয়া পেলেই ওরা বিদ্যালয়ে পড়তে পারে। তাই ওদের থাকবার একটু জায়গা, আর তার সঙ্গে একটা অন্নসত্র গড়ে দে।'— এই বলে ভগবতী দেবী একটু চুপ করে শেষে বললেন : 'এ তিন-খানা গয়না পরবার সাধ অনেক দিন থেকেই আমার মনে হয়েছে। আমি জানি, তুই আমার উপযুক্ত ছেলে। মায়ের এ সাধ তুই মিটাতে পারবি।'

মায়ের এ কথা শুনে ঈশ্বরচন্দ্র শুধু বললেন: 'মা, তোমার আশীর্বাদ থাকলেই সব হবে!—'

মা ভাবেন : 'ঈশ্বর আমার কীর্তিমান ছেলে।' আর ছেলে ঈশ্বর ভাবেন: 'আমার মায়ের মত সংসারে আর কোন মা আছে?'

দেখতে দেখতে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যালয় গড়ে উঠল। তখন গাঁয়ের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। গাঁয়ের সদ্‌গোপরা জমিতে চাষ আবাদ করে। কেউ বা হাল চষে। আবার কেউ বা পরের জমিতে দিন মজুরের কাজও করে। তাদের ছেলেরাও এই নতুন বিদ্যালয়ে পড়তে আসে। যাদের পরবার কাপড় নেই, তাদের কাপড় কিনে দেওয়া হয়।

দিনের বেলায় যারা জমিতে চাষ আবাদ করে, যারা পরের বাড়ীতে মজুরের কাজ করে, তারা রাতেই যা একটু সময় পায়। ঈশ্বরচন্দ্র তাদের কথাও ভাবেন। তাদের সুবিধের জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলেন। তারা তখন নৈশ বিদ্যালয়ে পড়তে শুরু করে।

ছাত্ররা পয়সা দিয়ে বই, শ্লেট কেনে না। বই, শ্লেট, পেনসিল, সব তারা বিনে পয়সায় পায়।

তখনকার দিনে মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। তাদের লেখাপড়া শেখবার জন্য বিদ্যালয় খোলা হল। মেয়েরা শুধু লিখত, পড়ত না, তাদের হাতের কাজও শেখান হত। থাকবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করাও হল। প্রায় যাট জন ছেলে বাড়ীতে থাকত। আর সে সঙ্গে অন্নসত্রও খোলা হল।

এ সব কাজের ভার নেন স্বয়ং ভগবতী দেবী। তিনি নিজে ছেলেদের ও মেয়েদের খোঁজ খবর নেন। এমন কি, অনেক সময় তাদের রান্না-বান্নাও তিনি নিজে করেন। ছেলে-মেয়েরা তাঁকে মা বলেই জানে। মায়ের স্নেহ, মায়ের যত্ন ও আদর ভগবতী দেবীর কাছ থেকে তারা পেয়েছে। ভগবতী দেবীও তাদের আপন ছেলে-মেয়ের মত স্নেহ, আদর করেন। তারা এখানে মায়ের কোন অভাব বুঝতে পারেনি। বিদ্যালয়ের নাম রাখা হয়—ভগবতী বিদ্যালয়।

এই বীরসিংহ গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হয়। এখানে গাঁয়ের লোকেরা তাদের রোগ দেখাতে আসে। তারা বিনে পয়সায় ডাক্তারকে দেখায়, ওষুধও পায় বিনে পয়সায়। দরকার হলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার রোগীদের বাড়ীতে বিনে পয়সায় রোগী দেখে আসেন। অনেক সময়, দুধ, সাবু, বাতাসা, মিছরী এ-সবও বিনে পয়সায় রোগীদের দেওয়া হয়। ঠাকুরদাস এ কথা প্রায়ই বলতেন : 'আমি নিজে ছোটবেলায় দুঃখে কষ্টে মানুষ হয়েছি। এমন কী অন্নকষ্টও পেয়েছি। আমার অন্নদান করা সবচেয়ে বড় কর্ম বলে মনে করি।' ঠাকুরদাস নিজে হাট বাজারে যান। অন্নসত্রের জন্য যা দরকার, তা দেখে শুনে সব কিনে আনেন।

এ সময়ে বিদ্যাসাগর মশায়ের মাইনেও বাড়ে। আগে তিনি তিনশ টাকা মাসে বেতন পেতেন। এবার আরও দু'শ টাকা মাসে বেতন বাড়ে। মাসে এখন তিনি পাঁচশ টাকা বেতন পান।

এবার মাকে জিগ্যেস করেন : 'মা, আমার আর কী কাজ করতে হবে, তা আমাকে বল।...' ভগবতী দেবী তখন বললেন : 'দেখ বাবা, যেখানে আমাদের দুঃস্থ গরীব অনাথ আত্মীয় স্বজন রয়েছেন, তাঁদের খোঁজ খবর নিয়ে, তাঁদের মাসে মাসে যদি কিছু সাহায্য করতে পারিস, তাহলেই আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়।...'

'তোমার সাধ পূরণ করাই আমার বড় কাজ...' তিনি বলেন।

মা নিজের জন্য কোনদিন কিছুই ছেলের কাছে চাননি। যখনই ঈশ্বর মাকে কিছু দিতে চেয়েছেন, তখনই মা ছেলের কাছে জানিয়েছেন পরের অভাব, দুঃখের কথা। পরের দুঃখ মোচন করা ছিল মায়ের একমাত্র সাধ। এ কাজে ছেলেও কোনদিন বাধা দেননি। হাসিমুখে মায়ের সব কথা মেনে নিয়েছেন তিনি। মা আনন্দ

পেয়েছেন দুঃখীর দুঃখ দূর করে।

১২৭৬ সাল, চৈত্র মাস।

একদিন বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ীতে আগুন ধরে। দেখতে দেখতে সেই আগুনে তাঁর বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সমস্ত জিনিসই সেই আগুনে ধ্বংস হয়। সবাই প্রাণে বেঁচেছিলেন, এই যা! কয়েক দিনের জন্য তাঁরা সবাই নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। বিদ্যাসাগর মশায় মাকে কলিকাতায় নিয়ে আসবেন বলে মনে করেন। তাই তিনি মাকে জিগ্যেস করেন : 'মা, এখন ত বাড়ীর কোন চিহ্ন নেই। তুমি কোথায় থাকবে? তোমাকে কলিকাতায় নিয়ে যেতে চাই।'

মা কিন্তু বেঁকে বসেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে উত্তর দেন : 'আমি কলিকাতায় কি করে যাই, তুই বল? এখানে যে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে পড়ে ওদের কে দেখবে? আর ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাই বা কে করবে?'

মায়ের এ কথায় ঈশ্বরচন্দ্র কি জবাব দেবেন? মা যা বলেছেন তা মিথ্যে বলেননি। মা-ই একমাত্র ওদের দুঃখের সমব্যথী।

শেষে ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের জন্য একখানা ঘর তৈরী করে দিলেন।

মা আর কলিকাতায় এলেন না। বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের দেখার জন্য তিনি বাড়ীতে রয়ে গেলেন।

একবার ঠাকুরদাস কাশীতে রয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র মাকেও কাশীতে পাঠান। তীর্থবাস করাই ঠাকুরদাসের শেষবয়সে অভিপ্রায় ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি কাশীবাসী হলেন। জীবনের শেষ ক'টা দিন কাশীবাস করে, কাশীতেই দেহত্যাগ করবেন, এই তাঁর ইচ্ছা।

ভগবতীদেবী সংসারের সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কাশীতে এসেছেন। তাঁর কিন্তু এ কাশীধামে মোটেও ভাল লাগে না। তাঁর মনে পড়ে, বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যালয়ের ঘরটি, আর ভাবেন, বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের ছেলেমেয়েদের কথা। তাঁর অভাবে তারা কতই না কষ্ট পাচ্ছে! অতিথিরা হয়ত আদর, সমাদরের অভাবে বাড়ী থেকে বিমুখ হয়ে যাচ্ছেন। তীর্থে এসেও এ সব কথা তাঁর মনে আসে।

একদিন কথা প্রসঙ্গে ঠাকুরদাসকে তিনি বলেন : 'আপনাকে এখনও সংসারে অনেকদিন বাঁচতে হবে। এত তাড়াতাড়ি সংসারের

কাজ ছেড়ে তীর্থে আসা আপনার উচিত হয়নি। আপনি দেশে ফিরে চলুন। দেশের লোকের অনেক উপকার করতে পারবেন, না হয়, কিছুকাল পরে আবার তীর্থে এসে বসবাস করবেন।'

ভগবতীদেবীর কথায় তিনি কিন্তু তেমন খুশী হলেন না। ঠাকুরদাস কাশীতেই থাকেন। ভগবতীদেবী বললেন : 'আমার দেশে থাকাই ভাল ছিল। দেশে গরীব দুঃখীদের সেবা করতে পারতাম। এতেই আমার আনন্দ, সুখ ভোগ।'

কিছুদিন পরে তিনি কাশী থেকে ফিরে আসেন বীরসিংহ গ্রামে।

অনাথা গরীব দুঃখীর সেবাই ছিল ভগবতীদেবীর সত্যিকার ধর্ম।

সংসারক্ষেত্রে

ভগবতী দেবী বলতেন : 'দেহের অলংকারে অহংকার বাড়ে। তাছাড়া, যাদের গায়ে গয়না গাঁটি নেই, তাদের প্রতি তুচ্ছ একটা ভাব আসে।'

নিজে তিনি খুবই সাধারণ ভাবে থাকতেন। ভোগ, বিলাস, আরাম তাঁর কিছুই ছিল না। ঘরের বৌরা তেমন গয়না গাঁটিও পরতেন না। তিনি একথাও মাঝে মাঝে বলতেন : 'ভোগ বিলাসে কি সত্যিকার সুখ হয়? যে সাধারণ ভাবে চলতে পারে, সে-ই সত্যিকার মানুষ।' আবার কখন কখন বলতেন : 'দেখনা, এ সংসারে অনেক মহাপুরুষ স্বেচ্ছায় ভোগ বিলাস বিসর্জন দিয়ে, পরের দুঃখ মেটাতে চেয়েছেন।' পরের কারণে নিজের সুখ বর্জন করে দুঃখকে মেনে নিতে ক'জনা পারেন? ভগবতীদেবী অতি সহজেই তা পেরেছিলেন। তিনি মেয়েদের বলতেন : 'তোমাদের বিয়ে হলে স্বামীর কাছে গয়না বা ভাল ভাল দামী শাড়ী পরবার দাবী করো না। সে টাকা দিয়ে যাতে সংসারে অপরের দুঃখ ঘুচাতে পার, তাই করো। দেখবে, এতে তুমিও আনন্দ পাবে, যাকে করবে, সে-ও অনেক আনন্দ পাবে। এর চেয়ে পুণ্যি কি আর আছে?—'

এ ধরনের উপদেশ ক'জন মা মেয়েদের দিতে পারেন? আর ক'জন মেয়েই বা এ সব হিতকথা শুনেন?

ভগবতী দেবী ছিলেন ঠাকুরদাসের সুখ দুঃখের সাথী। পুজো পার্বনের চেয়ে পতিসেবাই ছিল তাঁর বড় ধর্ম। এ ধর্ম সাধনে তাঁর জাঁকজমক ছিল না।

বড় মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। একদিন ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে বলেন : 'দেখো, মেয়েকে সৎ কুলীন পাত্রের হাতে দিতে হবে।'

'আমার মেয়ে যে শিক্ষা পেয়েছে তাতে বড় ঘরে বিয়ে দিলে হয়ত হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। যে মেয়ে ভোগবিলাসিনী তার গরীব-দুঃখীর প্রতি টান থাকে কম।'—ভগবতী দেবী উত্তর দিলেন।

ঠাকুরদাস কিন্তু ভগবতী দেবীর এ কথা সমর্থন করতে পারেন না। তাই তিনি বললেন: 'ধনীর ঘরের ছেলে হলেই যে পরোপকারী হবে না, এ কথা ভাবা ভুল। সৎ কাজ করার মূলে চাই সৎ প্রবৃত্তি। সদ্বংশে জন্ম হলে প্রায়ই সৎ হয়। যদি সৎ প্রবৃত্তি থাকে, ধনবান না হলেও তার সদনুষ্ঠানে মন থাকতে পারে।'

ভগবতী দেবী এ কথার প্রত্যুত্তর করলেন না। তাঁর যুক্তি ভগবতী দেবী মেনে নিলেন।

ঠাকুরদাস মেয়ের বিয়ে সদ্বংশেই দিয়েছিলেন। এ ঘটনা থেকে ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে আদর করে ডাকেন—'মনসা!'

ভগবতী দেবীর দৈনন্দিন সাংসারিক জীবনের অফুরন্ত কাজ ছিল। এত সব কাজ কী করে করতেন, ভাবতেও অবাক লাগে। অলসতা ও জড়তা এ দুটি জিনিস এ সংসারে সুখের অন্তরায়, এ কথা তিনি জানতেন। তাই, তিনি প্রথম পদক্ষেপে এই অলসতা ও জড়তাকেই পরিহার করেন।

নির্দিষ্ট সময়ে তিনি প্রত্যেকটি কাজ করতেন। তিনি বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বলতেন: 'যখনকার যা কাজ, তখন সে কাজ করবে। কোন হাতের কাজ পরে করব বলে ফেলে রাখতে নেই। নিজে যে কাজ করতে পারবে, সে কাজ অপর কাউকে দেবে না। নিয়ম ও শৃঙখলার সঙ্গে সব কাজ করবে। এলোমেলো ভাবে কাজ করবে না। এলোমেলো কাজে শুধু বিশৃঙখলা সৃষ্টি হয়, তা নয়, সময়েরও অপচয় করা হয়। এতে কাজেরই দেরী হয়। না ভেবে কোন কাজ করতে নেই। কাজ করার পর ভেবে লাভ নেই। কোন কাজ ভাল, কোন কাজ ভাল নয়, তা কাজ করার আগেই ঠিক করে নেবে।'

ভগবতী দেবী ছেলেমেয়েদের শুধু উপদেশ দিতেন, তা নয়, তিনি নিজেও সে-সব কাজ করে তাদের দেখিয়ে দিতেন।

গৃহের শুচিতা, গৃহের নিয়ম-শৃঙখলাই সংসারে শ্রীবৃদ্ধি করে —এ কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদের তিনি বলতেন: 'কেউ কিছু চাইলে

কখনও 'নাই' বলতে নেই। বাড়ীতে আমি না থাকলেও তোমরা যা পার দিও। কাউকে খালি হাতে ফিরাবে না।'

তিনি পরনিন্দা, পরচর্চাকে ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন: 'পরের যা ভাল দেখবে, তা-ই শিখবে। আর তার গুণের কথা বলবে। কাউকে সংসারে ছোট মনে করবে না। কাউকে হিংসে করবে না। কারও ভাল দেখলে, তাতে আনন্দ প্রকাশ করবে। তার সুখের সঙ্গী হবে। দেখবে, এতে তোমার মন বড় হবে।—'

ছেলেমেয়েরা তাঁর কথা মানত। কেউ তাঁর অবাধ্য হত না।

অনেক সময় দেখা গিয়েছে, বড় ভাই বা বড় বোন ছোট ভাই বোনকে মেরেছে বা বকেছে। তখন ছোট ভাই বা বোন ভগবতী দেবীর কাছে অভিযোগ করত এই বলে: 'মা, দাদা আমাকে মেরেছে।' আবার আরেকজন বলত: 'দিদি আমাকে বকেছে।'

ভগবতী দেবী তখন বলতেন: 'অন্যায় কাজ করেছ তাই তোমাকে বকেছে, মেরেছে, আর ঐ ধরনের কাজ করবে না। দেখবে, তখন তোমাকে সবাই ভাল বলবে, ভালবাসবে।'

আবার ভগবতী দেবী সময় সুযোগ বুঝে বড়দেরও বলতেন: 'আচ্ছা ছোট ছোট ভাইবোনদের ও-ভাবে মার কেন? ওরা তোমাদের দিনরাত দাদা, দিদি করে ডাকে। আর ওদের প্রতি তোমাদের টান নেই। ওদের একটু মিষ্টি কথা বললেই ওরা তোমাদের কথা শুনে থাকে।'—এ ভাবে তিনি বাড়ীর বড়দের ও ছোটদের উপদেশ দিতেন।

আবার দেখা গিয়েছে, বাড়ীর মেয়েরা কখন কখন নতুন বৌদির নামে ভগবতী দেবীর কাছে অভিযোগ করত। তিনি মেয়েদের বলতেন: 'বেচারারা ওদের মা বাপকে ছেড়ে আমার কাছে এসেছে। আমি যদি ওদের না দেখি, ওদের দিকে না তাকাই, তবে ওদের কে দেখবে বল? তোমরা যেমন আমার ছোট মেয়ে, ওরাও ঠিক তেমনি আমার কাছে। কই, বৌমারা ত একদিনও তোমাদের নামে কোন কথা আমার কাছে লাগায় নি। তারা বরং তোমাদের নামে আমার কাছে সবসময় সুখ্যাতি করে থাকে।'

তাঁর প্রতিটি কথার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে দরদ আর মমতা। তাঁর এ হেন স্নেহমাখানো তিরস্কারে তারা কখনও রাগ করত না।

এ ভাবে তিনি বাড়ীর মেয়েদের ও বৌদের মধ্যে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

নতুন বৌরা ভগবতী দেবীর স্নেহ-মায়ার বাঁধনে মায়ের অভাব বোধ করতে পারেন নি। ভগবতী দেবীর মধ্যে তাঁরা তাঁদের মাকে দেখতে পেয়েছেন। শ্বশুর-শাশুড়ীর গৃহই ছিল তাঁদের সুখের আধার।

সাংসারিক কাজে একদিন শাশুড়ী দুর্গাদেবী ভগবতী দেবীকে বলেন: 'মা, এখন তুমি সন্তানের মা হয়েছ। এখন সব কাজ নিজে করতে পার। আমার কাছে কি এখনও পরামর্শ নিয়ে কাজ করবে?'

এ কথায় ভগবতী দেবী জবাব দেন: 'মা, মেয়ে চিরকাল মায়ের কাছ থেকেই শিক্ষা নিয়ে থাকে। বাল্যকালে মাতুলালয়ে ছিলাম। সেইখান থেকে আপনার এখানে এসেছি। আপনি আমাকে লালন পালন করেছেন; সব বিষয় শিখিয়েছেন। এ সংসারে আপনি ছাড়া আর আপন কে আছে? সাংসারিক বিষয়ে আপনার যা অভিজ্ঞতা আছে, তা আমার কিছু নেই।'

দুর্গাদেবী এ কথার কি আর উত্তর দিবেন?

দুর্গাদেবীর চোখে আনন্দাশ্রু ভরে ওঠে। তিনি পুত্রবধূকে কাছে টেনে নেন। প্রাণভরে তিনি বৌমাকে আশীর্বাদ করেন: 'মা, তুমি চিরসুখী হও!' ভগবতী দেবী শাশুড়ীকে প্রণাম করেন ভক্তিভরে।

এরূপ পুত্রবধূ শাশুড়ীর মিলন সংসারে খুবই বিরল!

দুর্গাদেবীর মৃত্যুর পর ভগবতী দেবী নিজেকে খুব নিঃসহায় মনে করেছেন। সংসারের সব কাজের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন দুর্গাদেবী। ভাল মন্দ সংসারের সব কিছু ভগবতী দেবী শাশুড়ীর উপরেই ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। তাঁর বিচারে যা ভাল বুঝেছেন, তা-ই করে গিয়েছেন। তাঁর কাজের কেউ কোনদিন সমালোচনা করেন নি। নাতি-নাতিনীরা ঠাকুরমার কাছে সব সময় আবদার করেছে। আজ ভগবতী দেবী যে কাজেই হাত দেন সেখানেই দুর্গা-দেবীর স্মৃতি তিনি দেখতে পান।

ঠাকুরদাসই যে শুধু মাতৃহারা হয়েছেন তা নয়, ভগবতী দেবীও

মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিতা হয়েছেন। ভগবতী দেবীর মনে অনেক কথাই আসে। এ সংসারের সুখে দুঃখে আর তাঁকে দেখতে পাবেন না। আজও এ সংসারে অনেক কাজ বাকী রয়েছে যা দুর্গাদেবীর উপরই নির্ভর করেছিল। নাতি-নাতিনীদের বিয়ের ব্যাপারে দুর্গা-দেবীই ছিলেন একমাত্র পরামর্শদাত্রী। এখন সমস্ত দায়িত্ব, সমস্ত ভার একা ভগবতী দেবীকেই বহন করতে হবে। এ বাড়ির বড় বৌ তিনিই, তাই সংসারের ভাবনা-চিন্তা, দায়িত্ব সব কিছু তাঁরই উপর নির্ভর করে।

মাতৃহীনা শিশুর মত ভগবতী দেবী দুর্গাদেবীর জন্য কাঁদতেন। তাঁর মত শাশুড়ীকে ক'জন বধূ মাতৃবৎ মনে করতে পারেন?

মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মশায়ের নামে চিঠিখানি এসেছে। ভগবতী দেবী লিখেছেন : সেজভাই শম্ভুচন্দ্রের বিয়েতে যাবার জন্যে। এ সময় তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর নাম, যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কলেজের কর্তৃপক্ষ ছিলেন মার্সেল সাহেব। তিনি সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন। সাহেব তাঁকে ছুটি দিতে চাইলেন না। সাহেব তাঁকে বললেন : 'তুমি এ সময় গেলে কলেজের ক্ষতি হবে। অনেক কাজ জমে আছে!—'

রাত্রিবেলা। ঈশ্বরচন্দ্র সে রাত্রিতে ঘুমোতে পারলেন না। ভাইয়ের বিয়েতে বাড়ীতে সবাই এসেছে। মা তাঁর আসা পথের দিকে চেয়ে বসে আছেন। এসব ভাবনায় তাঁর সারারাত কেটে যায়।

পরদিন।

তিনি সোজাসুজি মার্সেল সাহেবকে জানালেন : 'সাহেব, ছুটি দিতে না পার, আমিই তোমার কাছ থেকে ছুটি নিচ্ছি। আমার মায়ের কথা তোমার চেয়েও বড়ো!'

সাহেব একটু বিস্মিত হ'য়ে ঈশ্বরচন্দ্রের মুখের দিকে তাকান। জিগ্যেস করেন : 'তাহলে তুমি কাজ করবে না?'

'ঐ ত তোমাকে বললাম, তোমার কাজের চেয়ে আমার মায়ের ডাক অনেক বড়ো। আমাকে আজই যেতে হবে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।'

তিনি দেখলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সত্যি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। তিনি বললেন : 'ঈশ্বর, তোমার মাতৃভক্তি দেখে সত্যি বিস্মিত হ'য়েছি! তোমার ছুটি আমি মঞ্জুর করলাম!'

বর্ষাকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পথ-ঘাট কাদাময়। এ দুর্যোগ

মাথায় নিয়েই বিদ্যাসাগর মশায় যাত্রা করলেন। সঙ্গে তাঁর ছিল ভৃত্য শ্রীরাম। কিন্তু সে দুর্যোগ পথে হাঁটতে পারছে না। কাজেই তিনি শ্রীরামকে বিদায় দিলেন। শ্রীরামের ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল না, তবুও তাকে ফিরে আসতে হল।

ঈশ্বরচন্দ্রকে যে কোন উপায়ে হোক বাড়ী যেতেই হবে। সেদিনই আবার ভাইয়ের বিয়ে। তিনি জানতেন, তিনি বাড়ী না গেলে, মার দুঃখের সীমা থাকবে না। ভাবতে ভাবতে চলেছেন পায়ে-হাঁটা পথে একাকী। দামোদরের তীরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বর্ষায় দামোদরের জলে দুপার ভেসে গেছে। প্রবল তরঙ্গ, স্রোত ছুটে চলেছে তীর বেগে। পারের লোক ও-পারে। এ-পারে নৌকা নেই। নৌকা পেলেও, সেদিন তিনি বাড়ীতে পৌঁছতে পারছেন না। অথচ আজই তাঁকে বাড়ীতে পৌঁছতে হবে।

নদীর পরপারে যাবার জন্য তিনি উদ্যোগী হলেন। যারা সেখানে ছিল, তারা তাঁকে নিষেধ করল: 'খবরদার, এ রাক্ষুসে দামোদরে সাঁতার দিও না!'

কিন্তু কে কার কথা শুনে? মায়ের আদেশে আজই ঈশ্বরকে বাড়ী যেতে হবে। ভীষণ দামোদরের বন্যাও তাঁকে রুখতে পারে না। যারা তাঁকে বাধা দিয়েছিল, তারা বিস্মিত হল। তারা সবাই বলে: 'বীর পুরুষসিংহ বটে! সাধু! সাধু।—'

পথে পড়ে পাতুল গ্রামটি—জননীর মাতুলালয়। এখানে দুপুরে আহার করে, আবার তিনি হাঁটা পথে চলেন। সন্ধ্যা হয়ে আসে। আবার পথিমধ্যে দস্যুভয়। ইষ্টদেবতা মাতৃপদ স্মরণ করে তিনি দ্রুতপদে হাঁটতে থাকেন।

গভীর রাত। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ নীরব।

বর ও বরযাত্রী চলে গেছে। জননী একটি ঘরে বসে ঈশ্বরের আসার প্রতীক্ষায় রয়েছেন: 'কই, ঈশ্বর ত এখনও এসে পৌঁছল না? তবে কি ও আমার চিঠি পায় নি?' এ সব কথা ভাবতে ভাবতে মার দু'চোখ ভরে জল আসে। তিনি সারাদিন অনাহারে রয়েছেন। সত্যি, ভগবতী দেবী কাঁদতে থাকেন। এমনি সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাড়ীতে পা দিয়েই ডাকতে থাকেন: 'মা, মা, আমি এসেছি।'—মা ছেলের কণ্ঠস্বর শুনে ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বলে ওঠেন: 'ঈশ্বর,

এত দেরী করে এলি? আয়!' এই বলে মা নিজের চোখের জল মোছেন।

মা হারানিধি ছেলেকে পেয়ে, আর ছেলে মাকে পেয়ে—আনন্দে তাঁদের দুজনের চোখে জল আসে। শেষে মা ও ছেলে সুখদুঃখের কথা শুরু করেন। তারপর, মা ও ছেলে খেতে বসেন।

এ ধরনের সন্তানবৎসলা মা আর মাতৃভক্ত সন্তান-এর উপমা কোথাও মেলে না!

দাম্পত্যজীবনে মধুময় চিত্র

সুলক্ষণা, ভাগ্যবতী ভগবতী দেবী ছিলেন ঠাকুরদাসের সর্বেসর্বা। সংসারের সব কাজে ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীর কাছ থেকে পরামর্শ নেন। আবার সংসারের বাইরের যে-সব কাজ থাকে, সে-সব কাজের পরামর্শও করেন তিনি। বলতে গেলে, বাইরে ও ঘরে তাঁর পরামর্শদাত্রী ছিলেন স্বয়ং ভগবতী দেবী। অনেক সময় তিনি ঠাকুরদাসের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

ভগবতী দেবীর অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল। কোথায় কি ভাবে, কোন কাজ করলে, সহজে সমাধা হতে পারে, তা তিনি জনতেন। আর কোন্ পরিস্থিতিতে কি ভাবে চললে সবাইকে খুশি করতে পারা যায়, তা তাঁর ভাল জানা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে, তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি দেখে ঠাকুরদাস বিস্মিত হয়েছেন। বিপদে পড়েও তিনি বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেন নি। কর্মে তিনি ধীর, স্থির। আর তাঁর কথার মধ্যে ছিল একটা আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা। ঠাকুরদাস তাঁর সাংসারিক জীবনেও ভগবতী দেবীকে পেয়েছিলেন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গীরূপে। তাই একদিন তিনি আদর করে নাম দিয়েছিলেন—মনসা। ঐ মনস নামটি ছিল তাঁর অন্তরের ডাক।

দাম্পত্য জীবনে ঠাকুরদাস ও ভগবতী দেবী ভাগ্যবান ও ভাগ্যবতী।

তাঁদের দাম্পত্য জীবনের একটি মধুময় চিত্রের বর্ণনা করছি :

অনেক সময় তাঁদের দুজনার বেশ অম্ল মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠত। তাঁদের মান-অভিমানের পালার দর্শক হলেন বাড়ীর নবীন বধূরা।

বধূরা অন্তরাল থেকে উঁকি ঝুঁকি মেরে তাঁদের মধুর রাগ-

অনুরাগ দেখতেন। আর বধূদের অধরে মৃদু হাসি ফুটে উঠত।

ঠাকুরদাস ছিলেন একটু রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ আর ভগবতী দেবী ছিলেন কোমল প্রকৃতি। সময় সময় তাঁদের "খুনসুঁটি" হত। সহজেই ভগবতী দেবী ভেঙে পড়তেন। কর্তার সঙ্গে অভিমান করে কর্ত্রী ঘরে খিল দিতেন। অভিমানিনী রুদ্ধ স্বরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন। গিন্নীর কান্নায় ঠাকুরদাস হক্‌চকিয়ে পড়তেন। কী করে গিন্নীর অভিমান ভাঙ্গাতে পারেন, তাই তিনি খুঁজতেন। ঠাকুরদাস ঐ মান ভাঙ্গানোর কৌশল জানতেন। ভগবতী দেবী বড় বড় মাছ পছন্দ করতেন। মাছ কুটে, রেঁধে পাঁচজনকে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসতেন। যখনই মানিনী ভগবতী দেবী এরূপ করতেন, তখনই ঠাকুরদাস বাজারে যেতেন। সারা বাজার ঘোরাঘুরি করে বড় দেখে রুই, কাতলা মাছ কিনে আনতেন। কর্তা মাছটাকে গিন্নীর মান-মন্দিরের দরজায় জোরে আছাড় মেরে ফেলে দিতেন। ঘরের ভিতর থেকে তিনি মাছ আছড়ানর শব্দ পেতেন। সহজেই বুঝতেন কর্তা বাজার থেকে মাছ এনেছেন। আর তিনি দরজা বন্ধ করে থাকতেন না।

তারপর, তিনি বঁটি আর ছাই নিয়ে মাছ কাটতে এগিয়ে যেতেন। ঠাকুরদাস একটু দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলতেন : 'খবরদার, মাছে হাত দিও না, বলছি।' কে কার কথা শোনে? বিজয়িনী ভগবতী দেবী তাঁর কথায় কোন আমলও দেন না। তিনি হাসিমুখে মাছটা হাতে নিয়ে বঁটিতে কাটতে শুরু করেন। কর্তা একটু বাধা দিয়ে বলতেন : 'হুঁ, আমার হুকুম না পেলে আমার মাছে যে হাত দেবে, সে বেশ টেরটি পাবে!—'

দাম্পত্য জীবনেও ভগবতী দেবী ভাগ্যবতী ছিলেন।

অনুপ্রেরিকা সমাজ-সেবার কাজে

বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপ।

ঠাকুরদাস এবং ঈশ্বরচন্দ্র সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। কি করে বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যালয়ের আরও উন্নতি হতে পারে, এ প্রসঙ্গেই তাঁরা দুজনে শলাপরামর্শ করছিলেন।

এমনি সময়ে ভগবতী দেবী সহসা চণ্ডীমণ্ডপে এসে হাজির হলেন। তাঁর চোখদুটি অশ্রুপূর্ণ। অশ্রুগদ্‌গদ্‌ কণ্ঠে বললেন: 'ঈশ্বর, আমাদের বাড়ীতে একটি মেয়ে এসেছে। ওর মা ওকে নিয়ে এসেছে। আহা কী কচি বয়স ওর! এই বয়সেই ও বিধবা হয়েছে। ওর দিকে তাকান যায় না। এর কি কোন বিহিত নেই রে!—'

মায়ের এ কথায় ঈশ্বরচন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়েন। সেদিন ঈশ্বরচন্দ্রও এই বালবিধবাকে দেখলেন। তখন তাঁর মনে এ কথাই বার বার আসছিল,—মায়ের এ হেন দুঃখ কি করে লাঘব করতে পারেন? সত্যি, এর প্রতিকার করাই হবে সমাজের বড় কাজ।—

মায়ের অনুপ্রেরণা পেয়েই ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম অনুপ্রাণিত হলেন সমাজ-সংস্কারের কাজে।

তারপর...

ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসেবার কাজে ব্রতী হলেন। তিনি একের পর এক হিন্দুশাস্ত্রের বইগুলি দেখে চলেন। গভীর গবেষণায় তিনি নিজেকে ডুবিয়ে দেন। একদিন তিনি তাঁর কাজে সফল হলেন। আনন্দে অধীর হয়ে তিনি মাকে জানালেন: 'মা পেয়েছি, পরাশর শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, 'বিধবা বিয়ে শাস্ত্রসম্মত।'

মা খুশী হয়ে বললেন: 'বাবা, তুই-ই পারবি এদের দুঃখ দূর করতে। আমি ত জানি, তুই আমার কী ছেলে। তুই যখন বিধবা

বিয়ে শাস্ত্রসম্মত জেনে নিয়েছিস, তখন আমি তোকে হাসিমুখে আশীর্বাদ করছি। আহা, যদি জন্মদুখিনীদের কোন গতি করতে পারিস, তা তুই কর। কিন্তু বাবা, একবার কাজে হাত দিলে তখন সমাজের ভয়ে, এমন কী আমি বা কত্তা বারণ করলেও তুই তোর কাজ থেকে কোনমতে সরে দাঁড়াস নে।—'

মায়ের কথায় ঈশ্বরচন্দ্র উৎসাহিত হন কাজের পথে। তারপর, তিনি ঠাকুরদাসের কাছে গেলেন। 'বাবা, আপনার অভিমত না পেলে ত কোন কাজে এগুতে পারছি নে।'—ঈশ্বরচন্দ্র বললেন।

ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রের সব কথাই মন দিয়ে শুনলেন। একটু ভেবে তিনি বললেন : 'কাজে নামবার আগে তুই আরেকবার শাস্ত্রীয় প্রমাণগুলি ভাল করে দেখে নিস। আমার শুভ কামনা তোর কাজে সব সময়ই পাবি। এজন্য হয়ত অনেক ঝুঁকি তোকে মাথা পেতে নিতে হ'বে। ভাল কাজ করতে গেলে একটু আধটু বাধা আসে বৈ কি। ওতে পিছু পা হলে চলবে না। তুই তোর সংকল্প ঠিক রেখে কাজ করে যা।'

ঈশ্বরচন্দ্র নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনায় কাজ শুরু করেন। সমাজের একদল লোক ঈশ্বরচন্দ্রের কথা মানতে রাজী হলেন না। এমন কী, তাঁদের শাস্ত্রের প্রমাণ দেখিয়ে দিলেও, তাঁরা সে সব শুনতে চান না। তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা রকম ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। অনেকে প্রকাশ্যে তাঁর কাজে বাধা দেন। সেদিন তাঁর কাজে শুধু দু'জনের কাছ থেকেই প্রথম প্রেরণা ও উৎসাহ পেয়েছিলেন—পিতা ঠাকুরদাস আর মাতা ভগবতী দেবী।

সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র নূতন আন্দোলন সৃষ্টি করলেন।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তিনি একখানা বই লেখেন। বইখানা বের করবার জন্য মা ও বাবার আদেশ চাই। তাঁদের অনুমতি না পেলে ত ঈশ্বরচন্দ্র এ কাজে হাত দিতে পারেন না। ঈশ্বরচন্দ্র মা ও বাবার অনুমতি নিয়ে সব কাজে হাত দিয়েছেন। আজও তিনি ঠাকুরদাসকে তাঁর কাজের অভিপ্রায় জানালেন। ঠাকুরদাস তাঁকে সানন্দে অনুমতি দিলেন বইখানা প্রকাশ করতে।

তারপর, ঈশ্বরচন্দ্র মায়ের কাছে গেলেন। মাকে বললেন : 'মা, আমি বিধবা বিবাহ বিষয় নিয়ে একখানি বই লিখেছি। তোমার

অনুমতি না পেলে ত বইখানা বের করতে পারছি না।'

এ কথা শোনা মাত্রই ভগবতী দেবী বললেন : 'এতে আর না বলার কি আছে? তুই বইখানা বের কর। আহা, তাদের কথা ভাবলে মন স্থির থাকে না। যাদের দিন কাটছে চোখের জলে, তাদের সুখী করবার উপায় তুই করতে যাচ্ছিস—এর চেয়ে মঙ্গলময় আর কী কাজ হতে পারে?' ভগবতী দেবীর সন্দেহ ছিল যে ঠাকুরদাস একথা জানলে হয়ত বাধা দিতে পারেন। তাই তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে বললেন : 'তুই একথা কর্তাকে কিছু বলিসনি।'

একটু মৃদু হেসে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : 'কেন মা?'

ভগবতী দেবী তেমনি দ্বিধা নিয়ে বললেন :'উনি হয়ত ভাবতে পারেন, তুই এ নিয়ে আন্দোলন করলে, তাতে ওঁর অনেক ক্ষতি হতে পারে।'

তিনি হেসে বললেন : 'মা, বাবার অনুমতি আমি আগেই পেয়েছি।'

এ সংবাদে ভগবতী দেবী খুব খুশী হলেন। তিনিও উৎসাহিত হয়ে আরও জোর দিয়ে বললেন : 'কর্তার যখন মত পেয়েছিস, তখন ভালই হয়েছে। নিজের কাজে বিশ্বাস রেখে কাজ করে যা!'

ঈশ্বরচন্দ্রের সমাজসেবার কাজে প্রথম অনুপ্রেরিকা হলেন মাতা ভগবতী দেবী।

ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে পিতা-মাতাই উপাস্য দেবতা ছিলেন। তাঁদের মতের বিরুদ্ধে তিনি কোনদিন কোন কাজ করেননি। আজকের এই বিধবা বিবাহের সমর্থন পেয়েছেন বলেই তিনি কাজের পথে এগিয়ে চলেছেন। পিতামাতা ছাড়া তিনি এ সংসারে কারও মুখের দিকে চেয়ে থাকতেন না।

বিদ্যাসাগর মশায়ের শিক্ষাগুরু ছিলেন প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মশায়। বিধবা বিবাহের ব্যাপারে তাঁর কোন মত ছিল না।

একদিন তিনি বিদ্যাসাগরকে বললেন : 'ঈশ্বর, তুমি নাকি বিধবা বিবাহের প্রচলনের আন্দোলন আরম্ভ করেছ? কত দূর এই জনরব সত্যি জানি না। যাক্, দেশের যাঁরা বিজ্ঞ, বিদ্বানমণ্ডলী, তাঁরা তোমার কাজের কতদূর সমর্থক, সে বিষয়ে অবহিত আছ

কি? সহসা বিচার যুক্তি না করে একদল অপরিণামদর্শী লোকদের নিয়ে এ ধরনের গুরুতর কাজে হাত দেওয়া কি শোভনীয়?'

এ কথা শুনে বিদ্যাসাগর মশায় জবাব দিলেন : 'আপনার প্রশ্নের ইঙ্গিতে আমার কাজের উৎসাহে বাধা সৃষ্টি করবার আশঙ্কা দেখছি। আপনি আমার শিক্ষাগুরু! আপনাকে শ্রদ্ধা করে থাকি। নতুবা আপনাকে—'

তর্কবাগীশ তাঁর কথা শেষ না হ'তেই ব'লে উঠলেন : 'নতুবা আমাকে এই আসন থেকে উঠিয়ে দিতে? ঈশ্বর, তুমি একাজে যেরূপ দৃঢ়সংকল্প ও একাগ্রচিত্ত তাতে ঐ ধরনের প্রত্যুত্তর পাব বলেই মনে করে এসেছি। এতে আমি মনঃক্ষুণ্ণ হইনি।—'

বিদ্যাসাগর তেমনি করে বললেন : 'আপনি যতটা মনে করেন আমি ঠিক ততটা সাহসের কথা বলছিলাম না। আমি অনেক গুণী বিজ্ঞদের কাছে আবেদন নিবেদন করেছি। আমি দেখতে পেয়েছি, তাঁরা সকলেই ক্ষীণবীর্য। যাঁরা আমাকে মুক্তকণ্ঠে সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন, এখন তাঁদের আচরণে বিস্ময়বোধ করছি। আমি এখন কাজে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি।'

তর্কবাগীশ মশায় বললেন : 'ঈশ্বর, তোমাকে বাল্যাবধি জানি। তোমার কাজের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বাধা দান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তুমি যে লোক-হিতকর, সমাজ-কল্যাণের কাজে হাত দিয়েছ, সে কাজে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ কর, এই আমার অভিপ্রায়।'

এ কথায় বিদ্যাসাগর মশায় বললেন : 'আপনার মুক্তকণ্ঠের সহানুভূতি সমাজের কল্যাণে আসুক এই আমার প্রার্থনা।'

তর্কবাগীশ মশায় কিন্তু আপন বক্তব্য ব'লে চলেন : 'ঈশ্বর, সমাজ-সংস্কারের কাজ কেবল রাজারাজড়ারাই করতে পারেন। অন্য কেউ এ কাজে হাত দিলে বিপুল অর্থবল ও লোকবল আবশ্যক। তুমি যখন রাজপুরুষদের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়েছ, তা তোমার কৃতিত্বের কথা। তোমাকে কয়েকটা হিতকথা বলতে এসেছিলাম। দেখছি তুমি বড় ব্যস্ত! চললাম, বিবেচনা করো।—' প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ তাঁর হিতকর উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

যে যে-কথাই বলুক না কেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাতে বিচলিত হন না। একাগ্রতা ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে তিনি তাঁর কর্তব্যপথে এগিয়ে যান।

বিবাহের মন্ত্রপাঠ আর দেখলেন কন্যার শ্বশুর কুল, পিতৃকুল বা মাতৃকুলের কে কন্যা সম্প্রদান করেন?

বিধবা বিবাহের যা কিছু খরচ তা তিনিই বহন করেন। অনেক সময় তিনি নিজের বাড়ীতেও বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজন, এমনকি ভাইরাও তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছেন।

গাঁয়ের অনেকে আবার এ কথাও বলল: 'গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে বিধবা মেয়ের বিয়ে দিয়ে সমাজ সংস্কার করে বড়াই কিসের? হ্যাঁ, যদি ভাইয়ের বিয়ে, নিজের ছেলের বিয়ে দিতে পারত, তবেই না দেখা যেত বিদ্যাসাগরের কেরামতি! এযেন পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া আর কি!'

কথাটা শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের কানে গিয়ে পেঁছিল।

সত্যি, বিদ্যাসাগর মশায় কথাটা শুনে প্রথমটা মনে দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন যাদের জন্য কাজ করছি, তারা এ অপবাদ দিতে পারে বৈ কি! একাজ করতে গিয়ে তিনি অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছেন। বলতে গেলে, ঋণের ভার তাঁকে একাই বহন করতে হয়েছে। ভাইরা কেউ এ কাজে এগিয়ে আসেন নি। তাঁরা বরং তাঁকে সব বিষয়ে নিরুৎসাহ করে এসেছেন।

সমাজের লোকের আর অপরাধ কি? বিদ্যাসাগর মশায় তাদের ঐ সব কথার কি আর উত্তর দিবেন? তিনি সহজেই বুঝলেন, তারা অন্যায় কিছু বলে নি।

বিদ্যাসাগর মশায়ের এক ছেলে ছিল। তাঁর নাম ছিল নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নারায়ণ তখনও বিয়ে করেন নি। স্বেচ্ছায় তিনি বিধবা বিয়ে করবেন বলে ঠিক করলেন। বিদ্যাসাগর ছেলের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। চিঠি পাবার আগেও তিনি বুঝতে পারেন নি, নারায়ণ বিধবা বিয়ে করতে চাইবে। বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণ সহজেই পিতার সামাজিক অবস্থা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই নারায়ণ এগিয়ে এলেন পিতার কাজকে সার্থক রূপ দিতে। সত্যি পুত্রের এ সৎকাজের জন্য পিতার এর চেয়ে আর কি গৌরব থাকতে পারে?

তখন নারায়ণচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্রকে যে চিঠিখানা লিখেছিলেন তার

অংশ বিশেষ এখানে তুলে দেওয়া হল। এ চিঠি থেকে সহজে বুঝতে পারি নারায়ণচন্দ্র পিতার সমাজ-সংস্কার কাজে কতখানি সহায়ক ছিলেন।

'আমার এমন গুণ নাই যে, আপনার মুখোজ্জ্বল করি, তবে জীবনের মহৎ ব্রত বলে, বিধবা বিবাহ প্রচলন করিয়া, বাল-বিধবার ভীষণ বৈধব্য যন্ত্রণা দূর করা উচিত। এ অধম সন্তানের তাহা অবশ্য সাধ্য। আমি তাহাতে পশ্চাৎপদ হইব না। তাহাতে আপনাকে কতকটা সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই আমার জীবন ধন্য হইবে। আর তাহা হইলে বোধ হয় আপনার সদভিপ্রায় সম্বন্ধে বিপথ-বাদীরাও সন্দিহান হইতে পারিবে না।—'

বিদ্যাসাগরের ছেলের বিধবা বিয়ের কথায় নিন্দুকের দল ভীষণ ভাবে পরাস্ত হল। সমস্ত দুর্জয় বাধা, দুর্গম পথ পেরিয়ে বিধবা বিয়ের প্রচলনে তিনি এগিয়ে চলেছেন। দেশের কোন বিরুদ্ধ শক্তি তাঁকে পিছু দিকে টেনে নিতে পারে নি। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছেন তবুও তিনি সংকল্পে রয়েছেন অটল।

সকলেই মনে করেছিল, ভাইরা যখন বিয়ের বিপক্ষে, তখন ছেলেও সে-ই দলেরই সমর্থনকারী।

নারায়ণচন্দ্রের বিধবা বিয়ের কথা শুনে বিদ্যাসাগর বললেন: 'ইহার অধিক সৌভাগ্য আমার আর কিছুই হইতে পারে না।—' বিদ্যাসাগরের ভাই ও আত্মীয়-স্বজনরা নারায়ণের এ বিধবা বিয়ের সমর্থন করতে পারেন নি। কেবলমাত্র মা ভগবতী দেবী নারায়ণের বিয়েতে সম্মতি জানালেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, নারায়ণের মা কিন্তু ছেলের বিয়েতে মত দিতে পারেন নি। এমন কী, ছেলের বিয়ের সময় মা উপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য বিয়ে হওয়ার পর মা চোখের জল ফেলে পুত্রবধূকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন: 'আমার বউকে নিয়ে আমাকেই ঘর করতে হবে। এর চেয়ে আর বড় সুখ কি আছে?—'

নারায়ণচন্দ্রের বিয়ে উপলক্ষে বিদ্যাসাগর তাঁর সেজ ভাই শম্ভুচন্দ্রকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এই চিঠিখানি থেকে তাঁর মনের কয়েকটি কথা বোঝা যায়: 'বিধবা বিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম; জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন

কাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মায়ের কাছ থেকেই তিনি পেয়ে এসেছেন উৎসাহ, উদ্দীপনা আর প্রেরণা।

বলতে গেলে, ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন কাজের পথে।

প্রথম দিনকার আঁধার পথের প্রথম আলো ভগবতী দেবীই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তাঁকে।

বিদ্যাসাগর মশায় মাঝে মাঝে বলতেন : 'আমার মা-ই আমাকে প্রথম কাজ শুরু করবার পথ দেখান।'

সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য তিনি ভারত সরকারের কাছে অনেক চিঠি লেখা-লেখি করেন। এমন কী তিনি ভারতের বড়লাটের সঙ্গে দেখাও করেন।

১৮৫৬ সাল, জুলাই মাস। বড়লাট আইন জারী করে দেন যে হিন্দুদের বিধবা বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত। এরপর থেকে বিধবা-বিবাহের প্রচলন শুরু হয়। আইন প্রচলন হ'লে হবে কি? সমাজ একে গ্রহণ করতে পারে না। একদল সমাজের লোক ঈশ্বরচন্দ্রের এ কাজের সহযোগিতা করেন। আরেকটি দলের সংখ্যা ছিল বেশী। তাঁরা বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেন।

সত্যি, ভাবলে অবাক হতে হয়, ঈশ্বরচন্দ্র কারও মুখাপেক্ষী হন নি। একাই বিশ্বজয়ী বীরের মত সংগ্রাম করেছেন।

একবার বিদ্যাসাগর মশায় পথ দিয়ে চলেছেন হেঁটে। এমনি চারদিক থেকে একদল লোক তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়। কেউবা বিদ্রূপ করে, আবার কেউ বা অশ্লীল গালি দেয়। তা'ছাড়া আবার অনেকে তাঁকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। এমন কী, হত্যা করার ভীতিও দেখানো হয় তাঁকে। তিনি এ সকল আমলই দিতেন না। ভয় বলে তাঁর জীবনে কিছু ছিল না।

একবার বিদ্যাসাগর মশায় জানতে পারেন, কলিকাতার এক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। এ সংবাদে তিনি কিছুমাত্র বিচলত হলেন না। বিদ্যাসাগর মশায় তখনি সেই ধনী ব্যক্তির আসরে গিয়ে হাজির হলেন। ঐ আসরে বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধেই গোপন কথাবার্তা হচ্ছিল। এ হেন সময় তাঁর আগমনে

সবাই হকচকিয়ে উঠেন।

প্রথমে তাঁকে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারেন নি। তাঁদের মধ্যে একজন পারিষদ তাঁকে প্রশ্ন করেন : 'আপনি কি মনে করে এখানে এলেন?'

এ কথায় তিনি উত্তর দিলেন : 'লোকের মুখে শুনতে পেলাম, আপনারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে আমাকে খোঁজাখুঁজি করছেন। তাই ভাবলাম, আপনাদের কষ্ট দিয়ে লাভ কি?—'

বিদ্যাসাগরের এ কথায় সকলেই লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকলেন। কেউ তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করলেন না।

এখানে আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি—ঈশ্বরচন্দ্রের লিখিত বিধবা বিবাহ বিষয়ক বইখানা বাজারে বেরিয়েছে। সমাজের কাছে এ বইখানা নূতন তত্ত্ব পরিবেশন করেছে, তা-ই বেশী লোকের বইখানা পড়বার আগ্রহ ছিল। এই বিধবা বিবাহের প্রচার কাজে অনেকে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরাও নানাভাবে প্রচার করে বেড়াতে থাকেন। পাঁচালীকাররা বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য পাঁচালী রচনা করেন। আবার এর বিপক্ষ দলও ছিল। সেই বিরোধীদল বিধবা বিবাহ যাতে সমাজে প্রচলিত না হয়, তার জন্য ছড়া, পাঁচালী, গান তৈরী করে। এমন কী, সেদিন তাঁতিরা তাঁতে বোনা কাপড়ের উপরে বিধবা বিবাহের সমর্থনে ছড়া, গান লিখে প্রচার করেছে। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে এর প্রচার অভিযান চলে।

এত বাধা নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় হটে যাননি। যতই বাধা এসেছে তাঁর কাছে, ততই তিনি উৎসাহিত হয়ে কাজে এগিয়ে গেছেন। তাঁর দৃঢ়সংকল্প থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সবসময়ে অন্দর মহল থেকে মা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছেন তাঁর কাজে।

বিদ্যাসাগর মশায়ের উদ্যোগেই প্রথম বিধবা-বিবাহ শুরু হয়। অনেকেই এ বিবাহে মজাদার দর্শক ছিলেন। যাঁদের আসতে বলা হয়েছিল, তাঁরা অনেকেই আসেননি। যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা অনেকে বিয়ে বাড়ীতে ভোজন করেননি। এমন কী, বিধবা বিবাহের সমর্থন খাতায় নাম সই করেননি। তাঁরা অনেকেই কৌতূহলী হ'য়ে দেখলেন,—চিরকাল চিরপ্রচলিত প্রথা ও সনাতন ধর্মবিরুদ্ধ বিধবা

সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নই। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, তাহা করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সংকুচিত হইব না।—'

আত্মীয় পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাই তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন, শুধু মা রয়েছেন তাঁর পাশে। মা নিজে এসে যোগ দিয়েছেন বিধবা বিয়েতে। বিয়ের যা কিছু কাজ, তার অনেক কাজই ভগবতী দেবী নিজের হাতে করে দিয়েছেন। শুধু কি তাই, বিয়ে বাড়ীতে তাদের সঙ্গে একজায়গায় বসে, তিনি খাওয়া-দাওয়া করেছেন।

একবার নাতি নারায়ণচন্দ্র ভগবতী দেবীকে একটু বিদ্রূপ করে বলেছিলেন : 'ঠাকুরমা, তুমি যে এদের সঙ্গে বসে আহার করছ, এতে যে তোমার জাত যাবে।'

ঠাকুরমা এ কথা শুনে নাতিকে উত্তর দিলেন : 'দোষ কি? ঈশ্বর বহু শাস্ত্রজ্ঞ! ঈশ্বর কি অন্যায় কাজ করতে পারে?'

ভগবতী দেবীর সাহচর্য পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র এগিয়ে গেছেন কাজে।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা এক জোট হল। তারা অনেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিপক্ষে দাঁড়াল। তারা প্রকাশ্যে বলল : 'বিধবা বিবাহ চালু যাতে না হয়, আমরা তাই দলবেঁধে করবো।' এ বলে তারা ভয় দেখালো আর অত্যাচার শুরু করলো।

সরকার ঘোষণা করেছেন যে, বিধবা বিবাহ আইনসম্মত। যদি কেউ এ কাজে বাধা দিতে আসে, সে আইনের বিচারে সাজা পাবে। কারণ সে আইনভঙ্গ করেছে, এই অপরাধে।

বিদ্যাসাগরের বাড়ীতে গাঁয়ের লোকেরা অত্যাচার আরম্ভ করেছে,—এ সংবাদ হাকিমের কানে গিয়ে পেঁ ৗছে। হাকিমের কর্তব্য কাজ হ'ল নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তাই হাকিম স্বয়ং তদন্ত করতে বীরসিংহ গ্রামে এলেন। হাকিম তদন্ত শুরু করেন। সবার আগে হাকিম ঠাকুরদাসের সঙ্গে দেখা করেন। হাকিম ঠাকুরদাসকে জিগ্যেস করেন : 'আপনার গাঁয়ের কোন কোন লোক আপনাদের উপর অযথা অত্যাচার, অনাচার করেছে—সেই বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত করতে এসেছি। আপনি তাদের নাম বলুন—

আমি তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করবো। আপনি ত ভালই জানেন, বিধবা বিবাহ আইনসম্মত। তাছাড়া, হিন্দুশাস্ত্রে এর অনেক প্রমাণাদি পাওয়া গিয়েছে। বিদ্যাসাগর মশায় যা কিছু করেছেন, তা সমাজের কল্যাণের জন্য।—'

ঠাকুরদাস হাকিমের কথায় ভারী খুশী হলেন। একজন বিদেশী হিন্দুশাস্ত্রের যা খবর রাখেন, তা হিন্দু হয়েও অনেকে তার কোন সন্ধান রাখেন না। সাহেবের প্রতি ঠাকুরদাসের শ্রদ্ধা জাগে। এ পরিস্থিতিতে ঠাকুরদাস কি করবেন, তা ঠিক করতে পারেন না।

এদিকে হাকিম সাহেব ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়ীতে এসেছেন এ সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

অনেক ভেবে চিন্তে ঠাকুরদাস কিন্তু শত্রুদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করলেন না। তিনি জানতেন, তাদের নাম বললে, তাদের সাজা হবে। তাই তিনি হাকিমকে উল্টো কথাই বললেন : 'আমার সঙ্গে এ গাঁয়ের সকলেরই সদ্ভাব আছে।—'

হাকিম তবুও বললেন : 'আমি সন্ধ্যার দিকে আবার আপনার বাড়ীতেই আসব। গ্রামের যারা বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা যেন সবাই আপনার বাড়ীতে হাজির থাকে।' এই বলে হাকিম বিদায় নিলেন।

এদিকে এ সংবাদ অন্দর মহলে গিয়ে পৌঁছে। ভগবতী দেবী এ খবর পেয়ে ভারী ভয় পেলেন। তিনি ভাবলেন : 'সত্যি, ওদেরই বা কি দশা হবে।'

ঠাকুরদাস ঘরে ঢুকতেই ভগবতী দেবী বললেন : 'দেখো, ওদের এখন বাঁচাতে হবে। ওরা না বুঝে আমাদের উপর অত্যাচার করেছে। ওদের উপর সরকার অত্যাচার করলে, তা আমরা কি করে দেখবো?' ভগবতী দেবীর চোখ বেয়ে জল পড়তে থাকে।—'তুমি হাকিমকে বুঝিয়ে বলো, ওদের উপর যেন কোন অত্যাচার না করে।'—এ বলে ঠাকুরদাসের মুখের দিকে তাকান।

হাসতে হাসতে ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে আদুরে নাম ধরে বলেন : 'ওগো মনসা, তুমি এজন্যে আর ভেবো না। হাকিম আসতে না আসতেই আমি বলে দিয়েছি, এ গাঁয়ের সবার সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব আছে।'

একথা শুনে ভগবতী দেবী সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ঠাকুরদাস ভগবতী দেবীকে বললেন : 'এখন তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। সবার বাড়ী বাড়ী গিয়ে তোমাকে একটি বার বলে আসতে হবে,—সবাই যেন আজ সন্ধ্যার দিকে আমাদের বাড়ীতে আসে। হ্যাঁ, হাকিমও আসবেন। ওরা এলে হাকিম সহজেই বুঝবেন যে ওদের সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। সবার সঙ্গেই আমাদের সদ্ভাব আছে।—'

ভগবতী দেবীই একাজের ভার নিলেন। তিনি বাড়ী বাড়ী গিয়ে সবাইকে ডেকে, খোঁজ করে বললেন : 'হাকিম তোমাদের নাম চেয়েছিলেন। আমরা তোমাদের কারও নাম বলি নি। তোমাদের সঙ্গে আমাদের সদ্ভাব আছে, একথাই বলেছি। তোমরা সবাই আমাদের বাড়ী যাবে কিন্তু। আর আমাদের ওখানেই তোমরা সবাই খাবে, দাবে।'

তারপর...

ভগবতী দেবীর কথা মত গাঁয়ের সবাই তাঁর বাড়ীতে এল। হাকিমও এলেন। হাকিম দেখলেন ও বুঝতে পারলেন, সত্যি পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে ঠাকুরদাসের বেশ বনিবনা আছে। সাহেব খুবই খুশী হলেন সবাইকে দেখে। হাকিমের নজর পড়ল ওদিকে এদের খাবার জন্য পাতা পড়ছে।—হাকিম আর কি করবেন? তিনি হাসি খুশী মনেই বিদায় নিলেন।

এই ভাবে ভগবতী দেবী পাড়া-পড়শীদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন; তাদের অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করেছেন।

কোন সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না তাঁর দয়া। তাঁর দান, তাঁর দয়া ছিল বিশ্বপ্রেম। পথ চলতে চলতে তিনি থেমে পড়েছেন। কার কান্নার শব্দ তাঁর কানে আসে। তাই থমকে দাঁড়ান। সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, অজানা, অচেনা পরিবার। কিসের দুঃখ বেদনায় তারা কাঁদছে। তাদের কান্নায় পায়ে-চলা পথিক থমকে দাঁড়ান। অধীর অধৈর্য হয়ে পড়েন তিনি। ঐ শোকার্ত পরিবারদের মধ্যে তিনিও গিয়ে বসেন। তিনিও তাদের সঙ্গে শোকাশ্রু ফেলেন।

এ বিশ্বপ্রেম...এর তুলনা কোথায় মেলে!

বিদ্যাসাগরের ছেলে নারায়ণচন্দ্র তখন ছোট ছিলেন। তিনি

বীরসিংহ গ্রাম থেকে মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসতেন। একা আসতে পারতেন না। তিনি ঠাকুরদা ঠাকুরদাসের সঙ্গেই কলিকাতায় আনাগোনা করতেন। একবার ঠাকুরমা ভগবতী দেবীর সঙ্গে নারায়ণচন্দ্র কলিকাতায় এলেন। তখনকার দিনে পায়ে হাঁটা পথেই যাত্রীকে যাতায়াত করতে হত।

ভগবতী দেবী নাতির সঙ্গে চলেছেন গাঁয়ের হাঁটা পথ ধরে। এক গাঁয়ের বাড়ী থেকে শোকার্তদের করুণ কান্না ভেসে আস্‌ছিল। ভগবতী দেবী করুণার মূর্তিমতী! সারা অন্তর তাঁর কেঁদে ওঠে তাদের কান্নায়। এ অচেনা গাঁয়ের সবই তাঁর অজানা। তবুও অজানা, অচেনাদের দুঃখে তিনি ভেঙে পড়েন। তিনি তাই নাতিকে বললেন: 'দাঁড়া ত, ঐ বাড়ীতে কারা কাঁদছে একটিবার দেখে আসি। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস। কোথাও যাস নে!' এ বলে তিনি সেই বাড়ীতে গিয়ে প্রবেশ করেন।

নারায়ণচন্দ্র তেমনি দাঁড়িয়ে থাকেন। অনেকটা সময় কেটে যায়। তবুও ঠাকুরমার ফিরে আসবার নাম নেই। দেরী দেখে বালক নারায়ণ সেই বাড়ীর ভিতর যান। তিনি দেখতে পান, ঠাকুরমা সেই বাড়ীর শোকার্তদের সঙ্গে কান্না জুড়ে দিয়েছেন। ভগবতী দেবী এ পরিবারের মধ্যে এসে নিজের সব কথা ভুলে গেছেন। তিনি যেন ঐ শোকার্ত পরিবারের একজন দুঃখী। অপরের দুঃখ বেদনার মধ্যে ক'জন নিজেকে এমন নিঃস্বার্থভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন?

তাঁর জীবন-স্মৃতিতে কত কাহিনীই না এমনি জড়িয়ে আছে!

কোন পরিবারে কারো মেয়ে হয়ত বাল-বিধবা হ'ল। এ সংবাদ তাঁর কানে যেতেই তিনি অধীর হয়ে ওঠেন। সেখানে ছুটে যান তিনি তাদের সান্ত্বনা দিতে।

বাল-বিধবার চোখের জল মুছাতে গিয়ে, নিজের চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে। নিজেই তাদের দুঃখে ভেঙে পড়েন। তিনিও শোকার্তদের সঙ্গে করুণ বিলাপ করেন। এমন কি, কখনো কখনো শোকে অধৈর্য হ'য়ে মাটিতে লুটোপুটি করেন। ঐ দৃশ্য দেখে মনে হয়, তাঁরই আপন কন্যা বুঝি বাল-বিধবা হয়েছে।

ধন্য তাঁর এই বিশ্বপ্রেম!

আরেকটি ঘটনা :

প্রতিবেশীর একটি ছেলের খুব অসুখ হয়েছে। এ খবর পেয়ে তিনি রুগ্ন ছেলেটিকে দেখতে যান। গরীব পরিবারের ঐ একটি মাত্র ছেলে রোগে ভুগছে। পয়সা কড়িও তেমন তাদের হাতে নেই যা দিয়ে রুগ্ন ছেলেটির ওষুধ পথ্যির কোন ব্যবস্থা করতে পারে। ভগবতী দেবীই ছেলেটির চিকিৎসা, পথ্যির ব্যবস্থা করে দেন। আর তিনি রোগীর সেবাযত্নের ভারও নেন।

ভগবতী দেবী আপন মায়ের মত সেবা করে এসেছেন ছেলেটিকে। কিন্তু মৃত্যু এসে তাঁর কাছ থেকে ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ভগবতী দেবীর কোলেই সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। পুত্র-শোকাতুরা মায়ের মত তিনি মৃতদেহ বুকে করে থাকেন। শোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন তিনি।

পরের বিয়োগ বেদনায় কে কবে এমনি করে ভেঙে পড়েন?

সেবার ঠাকুরদাসের অসুখের কথা শুনে তিনি কাশীতে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন আশী বছরের এক বৃদ্ধা রোগে ভুগছেন। সেবা শুশ্রূষা করবার তাঁর কেউ নেই। তাঁর পয়সা কড়িও নেই যে ওষুধ পথ্য কেনেন। ভগবতী দেবী রুগ্না বৃদ্ধার সেবার ভার নিলেন। তিনি বৃদ্ধার মলমূত্র নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন। বৃদ্ধা কিন্তু ভগবতী দেবীর এ কাজে ভারী লজ্জিতা হলেন। তাঁর এ হেন সংকোচ, লজ্জা দেখে ভগবতী দেবী বললেন : 'আপনি কেন এত সংকোচ বোধ করছেন? আপনি আতুর; আপনার সেবা করাই আমার অন্নপূর্ণার সেবা করা। এ কাজে আমার এতটুকুও ঘৃণা মনে হয় নি।—'

এ কথা শুনে বৃদ্ধা প্রাণভরে তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

তাঁর সেবার গুণে বৃদ্ধা রোগ থেকে সেরে উঠলেন। এখানেই তাঁর কাজ শেষ হ'ল না। তিনি বৃদ্ধার আর্থিক দুর্গতি দেখে, তারও সুরাহা করে দেন।

তিনি অসহায়দের সেবা করেই কাশীর অন্নপূর্ণা দেবীর সেবার সার্থকতা লাভ করেন।

মাতার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার

ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে ভগবতী দেবী কলিকাতায় আছেন।

একদিন ঈশ্বরচন্দ্র মাকে বললেন, 'মা, তোমাকে একটা কথা বলব?'

: 'বল না, তোর কী কথা? এত সংকোচ করছিস কেন?'—মা বললেন।

: 'মা, আমি তোমার একখানা ছবি তুলব ভেবেছি। পাকপাড়া রাজবাড়ীতে একজন ভাল প'টো সাহেব এসেছেন। সেই সাহেবই তোমার ছবি তুলবেন।—'

মা ছেলের কথায় একটু অবাক হলেন। পরে তিনি বললেন: 'পাগল ছেলে আমার! আমার ছবি দিয়ে কি হ'বে? ছি ছি ছি, ও কথা মুখেও আনিস নে।—'

মা ঐ কথা বললে কি হ'বে। ছেলে কিন্তু সহজে হাল ছাড়েন না। তবু মাকে বললেন: 'মা, ছবি কি তোমার জন্য তুলছি? ছবি আমার জন্য। যখন যেখানে থাকি, সেখানে তোমার ছবিও আমার সঙ্গে থাকবে। যখন আমার মাকে দেখবার সাধ হ'বে তখন আমি মাকে ছবিতে দেখতে পাব।—'

ভগবতী দেবী এ কথার কি আর উত্তর দিবেন? তবুও তিনি বললেন: 'আমি আর এতে কি বলব? যখন তুই ঝোঁক তুলেছিস, তখন কি সহজে ছাড়বি? যা ইচ্ছে, কর।—'

মায়ের সম্মতি পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ভারী খুশী হলেন।

: 'মা, সাহেবকে এখানে আনব, না, তুমি আমার সঙ্গে সাহেবের ওখানে যাবে?'

মা বললেন: 'তোর সাহেবের সামনে বসে ছবি তুলতে পারব না।'

এবার ঈশ্বরচন্দ্র বললেন: ‘মা, সাহেব খুব ভাল লোক। আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার একখানা ছবি সাহেব নিজে তুলে দিয়েছেন। সাহেবের ওখানে ছবি তোলার সব যোগাড় আছে। এখানে ছবি তোলার কিছু নেই। তাছাড়া পাকপাড়ার রাজারাও আমাকে খুব মান্য করেন।’

এরপর মা আর কোন আপত্তি করলেন না। মা শুধু বললেন : ‘বেশ, তোর সঙ্গেই যাব। নিন্দে করলে লোক বিদ্যাসাগরের মাকে করবে না, বিদ্যাসাগরকেই নিন্দে করবে—।’

যাক, মায়ের সম্মতি পেয়ে বিদ্যাসাগরের আনন্দ আর ধরে না!

এর কয়েকদিন পরেই মায়ের ছবি তোলা হয়।

একদিন মাকে ছবিখানা দেখিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন : ‘মা, যখন যেখানে যাব, তোমার ছবিও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আমার মন যখন তোমার জন্য খুব খারাপ লাগবে, তখন আমি তোমার ছবিখানা দেখব।—’

ছেলের কথা শুনে মা না হেসে পারলেন না। হাসতে হাসতে বললেন : ‘বেশ তাই করিস’।

মায়ের প্রতি ছেলের এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা কমই মিলে!

বিদ্বান, চরিত্রবান ও গুণবান পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন মাতার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার!

পরহিতায় জন্ম

১২৭৭ সাল।

ঠাকুরদাস কাশীধামে রয়েছেন। একদিন বাড়ীতে সংবাদ এল যে ঠাকুরদাসের খুব অসুখ হয়েছে। এ সময় ভগবতী দেবী বাড়ীতেই ছিলেন। এ সংবাদ পেয়ে তিনি তখন কাশীধামে যান। সেখানে গিয়ে তিনি ঠাকুরদাসের সেবা শুশ্রূষা করতে থাকেন। ঈশ্বরচন্দ্রও কলিকাতা থেকে কাশীতে গেলেন। তিনিও পিতৃদেবের সেবা করেন। ভগবতী দেবীর পরিচর্যায় ঠাকুরদাস ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন।

এই বছরের চৈত্র মাসের শেষ দিনটি ছিল চৈত্র সংক্রান্তি। সহসা এই দিনটিতে ভগবতী দেবী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেদিনই তিনি ইহধাম থেকে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল সাতষট্টি বছর।

মৃত্যুর ভিতর দিয়ে পুণ্যশ্লোকা, মহীয়সী ভগবতী দেবী গৌরব লাভ করেছেন।

প্রাতঃস্মরণীয়া ভগবতী দেবীর জীবনকথা অফুরন্ত। তাঁর জীবনের অনেক কাহিনীই আমাদের কাছে বিস্ময়কর!

তিনি তাঁর অন্তর দিয়ে সবাইকে ভালবেসেছেন। পরকে আপন করে নিয়েছেন কাছে টেনে। অপরের দুঃখে তিনি অভিভূত হ'য়ে পড়েছেন। তাদের চোখের জল মুছাতে গিয়ে, তিনি নিজেই চোখের জল ফেলেছেন। এমনি ছিল তাঁর অন্তরের অনুভূতি আর দরদ। এই দয়াই ছিল তাঁর সব চেয়ে বড় গুণ!

একদিন জীবনের দুঃখ দৈন্যের দিনে চরকায় সুতো কেটে, সেই সুতো বেচে কায়ক্লেশে সংসারও চালিয়ে এসেছেন। এ চরকা কাটা ছিল তাঁর নিত্য পুজোর মতো। আবার তেমনি সুখের দিনেও তিনি

চরকা কেটেছেন। সুখের দিনকে পেয়ে তিনি অতীতের দুঃখের দিনগুলির কথা ভুলে যাননি। তাই তাঁকে আমরা দেখি, প্রতিদিন রাত দেড়টার পর চরকায় সুতো কাটতে বসেন। এ ভাবে রাত তিনটা পর্যন্ত তিনি একা সুতো কেটে চলেন। এতে তাঁর এতটুকুও গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়নি। এ কাজ তাঁর চরিত্রের মাহাত্ম্যকে বড় করেছে।

যেবার হ্যারিসন সাহেব তাঁদের বাড়ীতে বেড়াতে আসেন, তখন সাহেব ভগবতী দেবীর চরকাটি দেখে জিগ্যেস করেন : 'ওটা কি?'

সেজ ছেলে শম্ভুনাথ সাহেবের এ প্রশ্নে খুশী হলেন না। কেন না, মায়ের ঐ চরকার প্রতি সাহেবের দৃষ্টি দেখে শম্ভুনাথ একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। শম্ভুনাথ চেয়েছিলেন, বৈষয়িক ব্যাপারে সাহেবের দৃষ্টি আনতে। সাহেবের প্রশ্নের উত্তরও ভাল করে তিনি দেননি।

তারপর,—শম্ভুনাথ রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে থাকেন। তিনি মায়ের চরকাটি তখনই ভাঙ্‌চুর করে ফেলেন। ছেলের এ ধরনের ব্যবহারে ভগবতী দেবী ভারী দুঃখিত হন। তিনি দুঃখে ঐ দিন অনাহারে থাকেন। শেষ পর্যন্ত, শম্ভুনাথ মায়ের জন্য আরেকটি নতুন চরকা নিয়ে আসেন। চরকা পেয়ে তিনি আবার অন্নজল গ্রহণ করেন।

কত অনুরাগই না ছিল তাঁর আপন কাজের প্রতি!

ভোগ বিলাস, সুখ তিনি সহজেই বিসর্জন দিয়েছেন। আবার এ ভোগ বিলাস আপন পরিবারের মধ্যেও প্রবেশ করতে দেননি। অহমিকা বলে তাঁর কিছু ছিল না।

একদিন বালিকা বধূ হয়েই স্বামিগৃহে ভগবতী দেবী এসেছিলেন। তাঁর বাল্যজীবন অতীত হয়েছে সংগ্রামের ভিতর দিয়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর্থিক উন্নতিতে সংসারের সচ্ছলতা দেখা দেয় কিন্তু কোন ভোগ, বিলাস, ঐশ্বর্য ও সম্পদের দিকে তাঁর মন কোনদিন টানেনি। এমন কি, তাঁর মানসিকও কোন পরিবর্তনও আসেনি।

এটাই তাঁর জীবনের পরম বিস্ময়ের কথা।—ভগবতী দেবীর মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে—'পরহিতায় জন্ম'।

ভগবতী দেবী কেঁদেছেন মানুষের শোকে, দুঃখে ও কষ্টে, আবার মানুষও চোখের জল ফেলেছে এই পুণ্যবতী দয়াবতী মহীয়সী ভগবতী দেবীর জন্যে।

শেষ চিঠি

বীরসিংহা-জননীর চিঠি

স্বস্তি

পরম কল্যাণীয় প্রাণাধিক
শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
জ্যেষ্ঠপুত্র বাবাজীউ চিরজীবিষু।
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষ।

বাবা ঈশ্বরচন্দ্র, তুমি কি স্নেহ ও মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া একবারে এ অভাগিনীকে ভুলিয়া গেলে? বাপ্‌রে একথা ভাবতে গেলে যে আমার বুক ফেটে যায়। বাবা ঈশ্বর, আমি যে আর চাতকিনীর মত কোল্‌কেতা থেকে আস্‌বার পথের দিকে চেয়ে থাক্‌তে পারি নাই। আজ ১৮।১৯ বছর হোল তুমি আমাকে ভুলে আছ। আজ ১৮।১৯ বছর তোমার চাঁদ মুখটি দেখ্‌তে পাই নি। বাবা, সকলেই বল্‌ছে বিদ্যাসাগর আর দেশে আস্‌বেন না। তবে কি বাবা, সত্য সত্যই তুমি আমাকে ভুলে গেছ? ঈশ্বর, প্রাণের ধন আমার, তবে কি আমি সত্যই তোমাহারা হোলাম্? এতদিন ত' বাপ্, তোকে কিছু বলিনি, সবার কথা শুনে শুনে আর যে প্রাণ ধরতে পারিনি বাবা। ঈশ্বর, বাপ্ আমার, একবার কোলে এস, মনের সাধ মিটিয়ে চক্ষু ভোরে তোর মুখটি দেখি, ঈশ্বর রে—এ!

বাবা, তোমার দুঃখিনী মায়ের এমন কি দোষ দেখ্‌লে যে, একেবারে নিষ্ঠুর হোয়ে ভুলে বোসে আছ? ঈশ্বর, ছেলের নিকটে আবার মায়ের দোষ আছে কি বাবা? তোর মত দিগ্‌বিজয়ী ছেলে যদি মায়ের দোষকে দোষ বোলে রাগ করে, তবে আর যারা কুপুষ্যি নিয়ে ঘর করে তাদের কি দশা হবে বল্‌ দেখি? বাপ্‌, তুমিই ত' বহিতে লিখে ছেলেদের শিক্ষা দাও, কে একজন দিগ্‌বিজয়ী রাজা মাকে অবোধ ও প্রখরা জেনেও পাছে মায়ের চোখে জল পড়ে, এই জন্য সত্‌ মন্ত্রীর সুমন্ত্রণাও শুন্‌তেন না। তুমি যে, আমার তাদের চেয়েও সদ্‌গুণের আধার।

আহা! এখন কেবল তোমার জন্য কাঁদি, আর আগেকার সকল কথা ভাবি। এককালে বাবা, তুমি আমাকে কি সুখীই না করেছিলে? কি ছিলাম আর কি না হয়েছিলাম, যেমন দুঃখ থাকতে হয় তা ছিল, ঈশ্বর আমার সকল দুঃখ ঘুচিয়ে যেমন সুখী কোরতে হয়, তা করেছিল। পরবার কাপড়টুকু পর্যন্ত ছিল না, ঈশ্বর আমার চির-জীবী হোয়ে থাকুক, কত অলঙ্কার পর্যন্ত পরিয়েছিল। তা অভাগিনীর কপালে কতদিন সুখ থাকে? আবার যে কাঙ্গালিনী সেই কাঙ্গালিনী হোয়ে বোসে আছি। ঈশ্বর মনে পড়ে কি? প্রথম-বারেই কেমন একখানা দামী গয়না দিয়েছিলে? তার জেল্লা কত, গুণ কত। দেশ চাউর হোয়ে গেল, কত লোক, কত সাহেব, কত জমিদার, দেখতে এল। আমার শরীরে আর আহ্লাদ ধরে না, গাঁয়ের মেয়েরা গয়নার নাম জিজ্ঞাসা করে, তা কি কোরে জানাব, এ দেশে ত' তখনও সে গয়না ওঠেনি, তুমি কেবল যা একখানি আমাকে দিয়েছিলে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে তুমি হাসতে হাসতে বললে, খেপাবেটি। ওর নাম ইস্কুল। ঈশ্বর, মায়ের মাথায় ইস্কুল নামে যে উজ্জ্বল মুকুট পরিয়েছিলে, তার গরবে আমি অঞ্চলটার মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, অঞ্চলশুদ্ধ আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকত। আর আর বোনেরা বোলত সার্থক বীরসিংহ। যা হোক বেটা পেটে ধরেছিলি? দিগ্‌বিজয়ী বেটা। তারপর বাবা, বছর কতক পরে দু'হাতের দুখানি গয়না দিয়েছিলে। একটির নাম ডাক্তারখানা, আর একটির নাম মেয়ে ইস্কুল। তারপর রাত্রি ইস্কুল প্রভৃতি কত কুচো গয়নাই দিয়েছিলে তার ঠিকানা নাই। আহা। বাবা, সে একদিনই গিয়েছে। এক সময়

চাষীরা ধান নিড়তে নিড়তে ধান বনের ভিতরে সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা কোরে অপর চাষীদিগে শুনিয়েছে, বাড়ী বাড়ী পোড়ো ছেলেতে গিস্ গিস্ কোরত, যেদিকে চাও, সেইদিকেই লেখাপড়ার চর্চা, যেন চারিদিকেই দুর্গোত্সবের মেলা। ডাক্তার, মাষ্টার, পণ্ডিত হোই হোই কোরত। আর এখন। এখন সকলই অন্ধকার। আমার ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই গেল। যে সকল বোনেরা আমার সুখের দশা দেখেছিল, গয়না-কাপড় দেখে হিংসাতে ফেটে গেছল, যাদের কাছে মাথা খাড়া কোরে দাঁড়াতাম, সেই বোনেরা আজ আমার দুঃখের দশা দেখে কত বলে। আজ নাকি তাদের ছেলেরা যোগ্যি হয়েছে, দু টাকা রোজগার কোর্তে শিখেছে, গায়ে দুখানা গয়না দিয়েছে, তাই আমার এখন শুধু হাত, ছেঁড়া কাপড়, খড়িউড়ো গা দেখে বলে, কেনগো বীরসিংহে, তোর সে সব কোথা গেল? তোর ঈশ্বর বরং আগেকার চেয়ে বড় মানুষ হোয়েছে, তার যেমন টাকা তেমনই আছে। তবে তোর এমন দশা কেন গো?

বাবা ঈশ্বর, তুমি আমার অতিশয় মাতৃভক্ত ছেলে ছিলে। আমার কপালের দোষেই আজ তোমাকে হারিয়েছি। আমারই কপালের দোষ নয় ত' কি? তুমি যাদের জন্য জ্বালাতন হোয়ে আমাকে অভাগিনী করে গেলে ওরা তোমার কাছে যাচ্ছে আসছে, টাকা আনছে, কাপড় আনছে, তাদিগে নিয়ে ত' বেশ আমোদ আহ্লাদ কোচ্ছ, কেবল কাঙ্গালিনী মাকেই কাঁদিয়ে গেলে? তা তোমার ভাই-ভগিনীদের প্রতি, তোমার স্নেহ মমতার জন্য আমি অসুখী নই, বরং বেঁচেছি। কেন না, তুমি তাদের প্রতিপালন না করলে আমি তাদিগে নিয়ে জড়িয়ে সাঁড়িয়ে মারা পড়তাম। আমি তোমাকে গর্ভে ধোরেই ধরায় ধন্যা হোয়েছি। সেই জন্যেই সময়ে সময়ে বড় বড় সাহেব পর্যন্ত তোর এ অভাগিনী মাকে দেখতে আসে। এখন আমার দেখাবার জিনিষ শোকসন্তপ্ত জীর্ণশীর্ণ কলেবর। বাবা, আয় না, আবার তোকে কোলে বোসে ছোট বড় সকল লোককে দেখাই।

বাপ্‌রে, যে স্কুলডাঙ্গায় একদিন বেদ পাঠ হোয়েছে, ফুল বাগানে ঝলমল কোরেছে, কত সাহেব-সুবো বেড়িয়েছে, তুমি আমার পাত্রমিত্র নিয়ে আলো কোরে বোসেছ, আজ সেই স্কুলডাঙ্গা বিষ্ঠা ও গো হাড়ে পরিপূর্ণ। যে বারান্দা বাড়িতে তুমি আমার দরবার

কোরে বোসতে, যেখানে প্রতিদিন শত শত লোককে অকাতরে অন্নদান কোরেছো, যে বাড়ীতে তোমার স্বর্গীয় পিতৃদেব জগদ্ধাত্রী পুজা উপলক্ষে মহোৎসব কোরে গেছেন, সেই ভিটা আজ বাবলা গাছে পরিপূর্ণ।

বাবা, শুনতে পাই যে, অভাগিনী বীরসিংহা মায়ের নাম কোরে নাকি তোমার চক্ষু দিয়া জল পড়ে? বাবা, শুনেও যে কাঙ্গালিনীর প্রাণ ঠান্ডা হয় রে। তবে আমার ঈশ্বর আমাকে এখনও ভুলেনি। বাবা, এতদিন ত' চুপ কোরেই কাঁদছিলাম, কিছু ত' বলিনি, তা আর যে, মায়ের প্রাণ থামে না বাপ্। বাবা, পেটের অসুখে নাকি বড় কষ্ট পাচ্ছ, না খেয়ে দেয়ে রোগা হয়ে গেছ, মুখটি একেবাড়েই শুকিয়ে গেছে? মা-মাসী-পিসির মায়া ছেড়ে একবার মায়ের কোলে এস না বাবা। মাসী-পিসির ঘরে যতই আদর হোগ, বাবা, মায়ের গুণ দুগ্ধের মত মিষ্ট ও গুণকারী আর কিছুই নাই জানবে। একবার এস বাপ্। দশ দিন আমার কাছে থেকে দেখ না, তোমার ঢের অসুখ সেরে যাবে। আমি তোমার ধাতু নাড়ী যেমন জানব তেমন তোমার কলিকাতা মাসী কি জানবে?

বাবা ঈশ্বর, তুমি যে আমার এ পুকুর ও পুকুর দেখতে, এ গাছতলায় ও গাছতলায় বোসতে ভালবাসতে, সে সব একেবারে কি কোরে ভুলে আছো বাবা? বাবা, সে সকলই আছে, কেবল তোমা বিনে আমার সকলই আঁধার। বাবা রামচন্দ্র, তোমার অযোধ্যাপুরী একবারে যে অন্ধকার বাবা, আর বনবাস কেন বাপ্, চোদ্দ বছর ছেড়ে আজ যে ১৮।১৯ বছর হোয়ে গেল। এবার এস বাপ্, একবার অক্ষম অকৃতজ্ঞ ভাইগুলোকে চারিদিকে নিয়ে বোস, দেখে চক্ষু সার্থক করি। বাবা, ভাগ্যবান দশরথ পুত্রশোকে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু পাষাণী কৌশল্যা মরেনি, পতিশোক পর্যন্ত পাসরে ছেলের চাঁদমুখটি মাত্র দেখবার জন্য বেঁচেছিল। বাবা, আমি কোন্ মহাপাপে তোর চাঁদমুখ দেখতে বঞ্চিত থাকব?

মেয়ে মানুষের মন, চুপ কোরে থাকতে পারিনি; বলি বাবা, তোমার কোলকেতা মাসীকে নাকি একখানা ভারি জড়োয়া গয়না দিয়েছ? তার নামটি নাকি, কালেজ বিল্ডিং? তা বেশ কোরেছ। তুমি যাতে মনের সুখে থাকবে তাই আমার ভাল, তাছাড়া যে যেমন

তপিস্যি কোরেছে। তা বাবা, বলি কি আর কিছু নয়, কাঙ্গালিনী মাকে কি একজোড়া শাঁখা দিয়েও ভরসা রাখতে নাই। বাবা, তুমি সুপণ্ডিত, দেশে—বিদেশের লোকে তোমার নিকটে সুপরামর্শ লইতে আসে। দেখ, এক মায়ের গর্ভে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সন্তান জন্মে, কেহ দেবতুল্য হয়, কেহ কেহ বা অধম পশুবৎ হয়, আর ভাই ভাই বিবাদও চিরকালই আছে, তা বোলে বাবা, কোন্ ছেলে কোন কালে ভেয়েদের উপর রাগ কোরে মাকে পরিত্যাগ কোরে যায়? তোমার মত পণ্ডিত বিশ্ব বাঙ্গালায় নাই। তোমরাই বল, জননী ও জন্মভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

বাবা ঈশ্বর, বোল্‌তে বোল্‌তে পাগলের মত কত কি বোলে ফেলেছি। রাগ কোরিসনি বাবা, তোর জন্য ভেবে ভেবে আমার আর সামাই সুসার নাই। আমার কপালে যাই থাকুক, তোর ভাই-ভগিনীদিগে যে প্রতিপালন করছিস্, তাই আমার পরম ভাগ্য। এখন বাপ্, একবার এসে দেখা দে। এই সময় আয় বাবা। এরপর এলে আর চোখে দেখতে পাব না। তোর জন্য কেঁদে কেঁদে এখনই দেখতে পাইনি; যে মেয়ে দিগ্‌বিজয়ী বেটা পেটে ধোরেছে, সেই অভাগিনীকেই বেটার জন্যে কাঁদতে হোয়েছে। সুনীতি ধ্রুবের জন্য কেঁদেছে, কৌশল্যা রামের জন্য কেঁদেছে, আমাকেও তোমার জন্য কাঁদতে হোচ্ছে। তাদের ছেলেরা তাদের মাকে একবারে বিসর্জন দিয়ে কাঁদায়নি, তাদের ছেলেরা মা-বাপের কথা ঠেলতে পারে নাই, তুমি বাবা, আমার এই কথাটি রাখ, এক এক বার আমাকে দেখা দিয়ে যাও। আমি গয়নাপাতির জন্য তোমাকে বিরক্ত কোরব না। কেবল কোলে কোরে প্রাণ শীতল কোরব।

জগদীশ্বর! আমার কপালে যাই কর, আমার প্রাণের ঈশ্বরকে চিরজীবী কোরে রাখ। কল্যাণমিতি। সন ১২৯৬ সাল, তাং—১৫ই অগ্রহায়ণ।

শুভাকাঙ্খিনী কাঙ্গালিনী
তোমার বীরসিংহা জননী।

পরিশিষ্ট

এক

—ঃ ভগবতীদেবীর বংশ-পরিচিতি ঃ—

পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ের বংশ-পরিচয়

পিত্রালয় ঃ গো-ঘাট, হুগলী জেলা

পিতা ঃ রামকান্ত তর্কবাগীশ
মাতা ঃ গঙ্গামণি দেবী

মাতুলালয় ঃ পাতুল (সারা), হুগলী জেলা

মাতামহ ঃ পঞ্চানন বিদ্যাবাগীশ
মাতুল ঃ রাধিকামোহন বিদ্যাভূষণ

শ্বশুরালয় ঃ বীরসিংহ, মেদিনীপুর জেলা

বড় দাদাশ্বশুর ঃ ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার
দাদাশ্বশুর ঃ উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত
শ্বশুর ঃ রামজয় তর্কভূষণ
শ্বাশুড়ী ঃ দুর্গা দেবী
স্বামী ঃ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
দেওর ঃ কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

চারপুত্র	ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর;
	ঃ দীননাথ ন্যায়রত্ন;
	ঃ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
	ঃ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তিন কন্যা	ঃ মনোমোহিনী দেবী;
	ঃ দিগম্বরী দেবী
	ঃ মন্দাকিনী দেবী
জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ	ঃ দিনময়ী দেবী (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্নী)
নাতি	ঃ নারায়ণ বিদ্যারত্ন
নাতবৌ	ঃ ভবসুন্দরী দেবী
চার নাতনী	ঃ হেমলতা দেবী
	ঃ কুমুদিনী দেবী
	ঃ বিনোদিনী দেবী
	ঃ শরৎকুমারী দেবী
চার নাতজামাই	ঃ গোপালচন্দ্র সমাজপতি
	ঃ অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়
	ঃ সূর্যকুমার সর্বাধিকারী
	ঃ কার্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট

দুই

—ঃ মুখে মুখে বল ঃ—

১. মাতার প্রভাব পুত্রের উপর

১। 'পরের দুঃখ দূর করতে হয়।' —এ কথা কে বলেছিলেন? কাকে বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?
২। 'স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা দিয়ে তিনি শাসন করতেন।' —এখানে 'তিনি' বলতে কাকে বুঝায়?
৩। "ঘাঁড়কেঁদো" কে, কাকে ডাকতেন? "ঘাঁড়কেঁদো" কথার অর্থ কি?
৪। "স্নেহ-মমতা ও বাৎসল্যের শাসনই সত্যিকার শাসন।" —এখানে কাদের শাসনের কথা বলা হয়েছে?

২. মাতুলালয়ের পরিবেশে

১। ভগবতী দেবীর ছোটবেলা ও শৈশব জীবন কোথায় অতিবাহিত হয়েছে?
২। ভাল কাজে কে তাঁকে সব সময় উৎসাহ দিয়ে এসেছেন?
৩। কোন পরিবেশে ও কার আদর্শে ও প্রভাবে ভগবতী দেবীর ভবিষ্যৎ-জীবন গড়ে উঠেছিল?
৪। "মা, আমি জানি, মামা আমার এ কাজে বকবেন না।" এখানে "মা" "আমি" "মামা" —বলতে কাদের বুঝায়? তাঁদের নাম কি?
৫। "ভগবতী" নামটি কি কারণে সার্থকতা লাভ করেছে, তা সংক্ষেপে গুছিয়ে লেখ।
৬। সঠিক উত্তরটির মাথায় টিক চিহ্ন দাও ঃ—
ভগবতী দেবী ঈশ্বরচন্দ্রের মাতা হলেও তিনি ছিলেন সবার দেবী/সবার জগৎমাতা/সবার মা।

৩. শ্বশুরালয়ের পরিবেশে

১। "গাঁয়ে কি মানুষ আছে? সব ভেড়ার দল—।" —এ কথা দুঃখ করে কে বলেছিলেন? কেন বলেছিলেন?
২। একটি বাঘের সঙ্গে কার লড়াই হয়েছিল? সে লড়াইতে কে কার কাছে কাবু হল?
৩। রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ছেলের নাম কি?
৪। ভগবতী দেবীর সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছিল?
৫। দুর্গা দেবী কার মাতা ছিলেন?
৬। ভগবতী দেবীর দৈনন্দিন জীবনের কর্মসূচী কি ছিল, তা লেখ।
৭। কোন গুণে তিনি পাড়া-পড়শীদের প্রীতির বাঁধনে বেঁধেছিলেন?
৮। "নিস্তব্ধ রাত্রি। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। শুধু এ বাড়ীর একজন নারী এখনও জেগে আছেন। আপন মনে চরকায় তিনি সুতো কাটেন।" এখানে কোন নারীর কথা বলা হয়েছে?

৪. আতিথেয়তা, দয়া, ধর্ম, সততা

১। "হে সূর্যদেব, এই বধূ যেন ধনে, বংশে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন, এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।" —এ কথা কে বলেছিলেন? "এই বধূ" —এখানে কাকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে? কোন প্রসঙ্গে ঐ কথাগুলো বলা হয়েছে?
২। হ্যারিসন সাহেব কে ছিলেন? ভগবতী দেবী সাহেবকে আমন্ত্রণ-চিঠিতে কি লিখেছিলেন?
৩। সাহেব কোন আসনে বসে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করেছিলেন?
৪। "আপনার কত ঘড়া সম্পদ আছে?" —এ প্রশ্ন কে কাকে করেছিলেন? ভগবতী দেবী এ প্রশ্নের উত্তর কি দিয়েছিলেন?
৫। ভগবতী দেবী বাড়ীতে কেন 'অন্নসত্র' খুলেছিলেন? 'অন্নসত্রে'র কাজ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৬। একদিন ঈশ্বরচন্দ্র মাকে জিগ্যেস করেন, "......মা, আমার বড় সাধ তোমাকে কিছু দেই। মা, তোমার কী কী গয়না পরবার সাধ হয়, তা আমাকে বল।" ছেলের এ কথা শুনে মা ছেলের কাছে কি কি ধরনের ক'টি গয়না চেয়েছিলেন?
৭। কাদের জন্য বীরসিংহ গ্রামে নৈশ-বিদ্যালয় খুলেছিলেন?

৫. সংসার ক্ষেত্রে

১। "এর চেয়ে পুণ্যি কি আর আছে?" —কি প্রসঙ্গে ভগবতী দেবী মেয়েদের এই উপদেশ দিয়েছিলেন?
২। কোন দুটি জিনিস সংসারে দুঃখের অন্তরায়—ভগবতী দেবী মেয়েদের প্রায়ই বলতেন?
৩। বাড়ীর প্রতিদিনকার কাজ কি ভাবে করলে সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠুভাবে করা যায়—ভগবতী দেবী এ বিষয়ে কি উপদেশ দিয়েছিলেন তা লেখ।

৬. মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র

১। ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তির ঘটনাটি সংক্ষেপে লেখ।
২। যেখানে যেখানে ভুল আছে, তা সংশোধন কর:—
মা হারানিধি ছেলেকে পেয়ে আর ছেলে মাকে পেয়ে আনন্দে তাদের দুজনের চোখে জল আসে। শেষে মা ও ছেলে সুখদুঃখের কথা সুরু করে, তারপর মা ও ছেলে খেতে বসে।

৭. সাংসারিক জীবনে মধুময় চিত্র

১। 'মানসী' নাম ধরে কে কাকে ডাকতেন?
২। "হুঁ, আমার হুকুম না পেলে আমার মাছে যে হাত দেবে, সে বেশ টেরটি পাবে।" —এ কথা কে কাকে কি প্রসঙ্গে বলেছিলেন?
৩। কে মাছ কুটে, রেঁধে কাদের খাওয়াতেন?
৪। শব্দের অর্থ বল:—
বিস্মিত, নবীন, অন্তরালে, অনুরাগ, অধর ও কোমল।
৫। বাক্য রচনা কর:—
জটিল সমস্যা, মধুময় চিত্র, অম্ল-মধুর, হক-চকিয়ে, ও ঘোরাঘুরি।
৬। লিঙ্গ পরিবর্তন কর:—
ভাগ্যবান, বিজয়িনী, পরামর্শদাত্রী ও কর্তা।

৮. অনুপ্রেরিকা সমাজ-সেবার কাজে

১। "এর কি কোন বিহিত নেই রে!" এ কথা কে কাকে বলেছিলেন? কি প্রসঙ্গে ঐ কথা বলা হয়েছিল?
২। সমাজ-সেবার কাজে ঈশ্বরচন্দ্রকে কে প্রথম অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন?
৩। "বিধবা বিয়ে শাস্ত্র-সম্মত।" —এ কথা কোন শাস্ত্রে উল্লেখ আছে?
৪। "বাবা, তুই-ই পারবি এদের দুঃখ দূর করতে।" —এ কথা কে ক বলেছিলেন? কাদের দুঃখের কথা এখানে বলা হয়েছে?

৯. মাতার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার

১। ঈশ্বরচন্দ্র ভগবতী দেবীর ছবি কেন তুলতে চেয়েছিলেন?
২। মায়ের ছবিখানি দেখিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মাকে কি বলেছিলেন?
৩। কোনগুণে ঈশ্বরচন্দ্র মাতার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ছিলেন?

১০. পরহিতায় জন্ম

১। কত বয়সে পুণ্যশ্লোকা, মহীয়সী ভগবতী দেবীর মৃত্যু হয়েছিল?
২। ভগবতী দেবী কোন গুণে মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন?

—